ফুল-ফোটানো মানুষ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দি সী বুক এজেন্সী

২০১এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলকাতা- ৭

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৬১

দি সী বুক এজেন্সী-র পক্ষে ২০১এ মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, কলকাতা- ৭
থেকে জয়ন্ত সী কর্তৃক প্রকাশিত এবং কমলা প্রেস, ২০৯এ বিধান সরণি,
কলকাতা- ৭ থেকে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

মাল্যবান, গীতা ও সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের

করকমলে

ফুল-ফোটানো দেশের গল্প

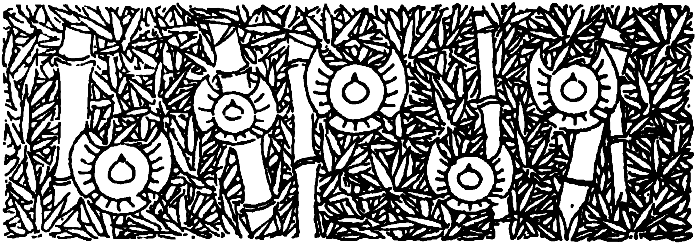
পুবদেশি দুনিয়ার পূর্বপ্রান্তের সাগর-ভাসা দ্বীপভূমির মতো উদয়সূর্যের দেশ জাপান, সূর্য তাদের দেবী, দেবী অমতেরাসু। আরো দেবতারা উর্ধ্ব থেকে করুণা-চোখে চেয়ে তার দিকে, তার শরৎপাহাড়ের গা ভরা হলুদ-গোলাপি পত্রপুষ্পের রঙ— এই সূর্য আর সমুদ্রের নিরবধি বিস্তারের মধ্যে জাপান একদিন সাধনা করেছিল সৌন্দর্য আর প্রশান্তির। কোরিয়ার হাত ধরে সোনার বুদ্ধ মূর্তি আর অমূল্য বুদ্ধ বাণী পৌঁছল এসে ষষ্ঠ শতাব্দীতে, বুদ্ধ অমিদর অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা হল দ্বাদশ শতাব্দীতে— ইতিহাসের কামাকুরা অধ্যায়ে।

ফুল বড়ো প্রিয় সবার এখানে। কোন্ ফুল? শরতের চন্দ্রমল্লিকা, না বসন্তের চেরী? না কি বরফ-শীতের বেগুনি-রক্তিম প্লাম ফুল, জাপানিতে যাকে বলে উমে? রবীন্দ্রনাথ জাপানে গিয়ে একটি মেয়েকে পুষ্পপাত্রে ফুল সাজাতে দেখেছিলেন : "সে যেন কার আরাধনা, তাতে কত নৈপুণ্য, কত নিষ্ঠা।" আরো দেখেছিলেন, "এখানে যে লোক অত্যন্ত গরিব সেও নিজের পেটের ক্ষুধাকে বঞ্চনা করেও এক-আধ পয়সায় ফুল না কিনে বাঁচে না।" আর এমন ফুল যে ফোটাতে পারে আপন হাতে? অসময়েও পারে? পুরোনো জাপানী তরুলতা-পশুপ্রাণীর রূপকথায় এমনই এক গরিব বুড়োমানুষের গল্প পাই দৈবশক্তি পেয়েছিল যে গাছে গাছে ফুল ফোটাবার।

জাপানে পুরোনো গল্প হল হানাশি বা মোনোগাতারি, রূপকথার গল্প বলতে মুকাশি-বানাশি। নানান গল্পের সঙ্গে এ বইয়ে জোড়া দেয়া হল দু-একটি পদ্য লেখাও— লোকস্মৃ[illegible] ভাণ্ডার থেকে উদ্ধৃত করে।

প্রথম দিকের ফুজি পাহাড়ের কয়েকটি কবিতা 'মান্'ইয়োশ্'র, দশখানা স্ক্রোলে বাঁধা শেষ সপ্তম থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত লেখা সাড়ে-চার হাজারের বেশি কবিতার পুরোনো সংগ্রহ সে বই। একটি গল্পে যে হাইকের পালার উল্লেখ আছে সে হল 'হাইকে মোনোগাতারি'র বীরগাথা, মিনিমাতো আর তাইরা দুই রাজবংশের যুদ্ধবিরোধের এই বীরত্ব কাহিনী বেঁধে তোলা হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়াতে, ভ্রাম্যমান চারণ কবিরা গেয়ে বেড়াতেন স্থানে স্থানে।

সূচীপত্র



চাঁদের খরগোশ

কত কাল আগে কে জানে। শেয়ালে শশতে আর হনুমানে ভারি ভাব। সারু হনুমান উসাগি খরগোশ আর কিৎসুনে শেয়াল!

গা জড়িয়ে থাকে তিনে মিলে— এক ঘরে একত্তরে। মাঠে বনে ঘোরে, ফলপাকড় ·ছেঁড়ে, ছুটে-ধেয়ে চলে, পাহাড় বেয়ে ওঠে তিনে মিলে— তিন বন্ধুতে। কারও সাথে কারোর তিলেকের ছাড়াছাড়ি নেই।

স্বর্গের বিধাতার কানে গেল একদিন সেই কথা। এমন নাকি বন্ধুতা— খাওয়াখায়ি দুনিয়ার দেশে? দেখি তো গিয়ে, কী ব্যাপার!

বুড়োসুড়ো সেজে ছেঁড়া কানি প'রে ধুঁকতে ধুঁকতে গিরে হাজির তিনজনার পাতচালা বাসাবাড়িতে— "কে আছিস গো? অতিথ এলুম, খিদেয় মরছি—"

"কে?" মুখিয়ে বেরিয়ে এসেছে তিনজনাতে।

"বুড়ো মানুষ রে বাবা, অতিথ।"

"অতিথ, তো ঘরে এসো।"

"খিদেয় মরছি রে বাবা। থাকলে চাট্টি দে কিছু খেতে।"

সে আর বেশি কী? হনুমান আগ বাড়িয়ে লাফ দিয়ে গাছে চ'ড়ে

পেড়ে নিয়েলো একগুচ্ছের টস্‌টসে জামফল।

জাম পেতে দেরি। টপাটপ্ গালে ফেলে নিমিষে সে শেষ। আর কিছু নেই রে বাবা?

শেয়াল ছুটে বেরিয়ে গিয়ে সোঁতা থেকে ধরে নিয়েসেছে এতখানি এক মাছ।

সেটি পোড়াবার যা দেরি।

"আর কিছু নেই রে বাপ?"

শশ খরগোশ? সে কিন্তু ঘরের চার ভিতে ডিঙি দিয়ে দিয়ে খালি ঘুরছেই, কোথাও গেলও না, কিছু আনলও না।

"এ কেমনধারা?"

হনুমান চোখ গরম করে বলে ওঠে, " এ কেমন হল তোর শশ?"

শেয়াল গোঁফ ফুলিয়ে তমতম করে ওঠে, "এ কেমন ব্যাভার তোর শশ?"

"তো যা, শুকনো কাঠ ভেঙে আন ওইখান থেকে।"

খরগোশ আনলে কাঠকুটো ভেঙে।

"জড়ো ক'রে আগুন ধরা কাঠে।"

খরগোশ পাথর-ঘষা দিয়ে জ্বালল আগুন।

"দে কাঠ আগুনে। আরো দে কাঠ আগুনে।"

আগুন যখন লকলক করে রাঙা হয়ে উঠল, আচমকা দুজনে দু দিক থেকে খরগোশকে ঝাপটে তুলে ছুঁড়ে দিল তার ভেতর। সে আর হুঁ-না করবার সময় পেলে না।

তারপর আগুনে পরিপূর্ণ সুপক্ক হতে দেহখানা বের ক'রে ছাড়িয়ে নুন-ঝাল রসিয়ে পাতার থালে সাজিয়ে খেতে দিল অতিথিকে।

"পেট ভরল?"

মুখ মুছে অতিথ বলে, "পরিতোষ হলুম বাবা।" ব'লে, বুড়োর কায়

ছেড়ে, নিজ রূপ ধরে দাঁড়িয়ে উঠলেন বিধাতাঠাকুর। দুজনে সভয়ে পিছিয়ে গেল।

তারপর সমঝে করজোড়ে বলছে একজোটে: "বন্ধুকে খাওয়ালুম মেরে, দেবতা গো, খুশি হও তো শ-বচ্ছর পরমাইয়ের বর দিয়ে যাও।"

দেবতা বললেন, "অমর পরমাই দেবো ওই মরা জীবটাকে।" ব'লে, ওদের দিকে আর না চেয়ে জীইয়ে তুললেন মরা খরগোশকে, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন চাঁদের দেশে—

সে এখনও আছে চাঁদের দেশে। চাঁদ ভরে উঠলে আজও পরিপূর্ণ দেখা যায় খরগোশ লাফ দিতে উঠছে চাঁদের ভেতর, সে কি পরম খুশিতে, না নীচে দেশে ফিরে আসার আকূতিতে, কে জানে।

চাঁদবাসী এই খরগোশকে নিয়ে জাপানের জেন সাধু রিয়োকান এক পদ্য লিখেছেন, শোনো কেমন:

গাঁয়ের লাগোয়া বন, তার এক কোণে
চালা বেঁধে কারা আছে দেখ তিনজনে।
এমনি বন্ধু— কেউ নয় কারও আন—

কারা বলো তো? ওই তো—

খরগোশ আর শেয়াল আর হনুমান।
এক থালে খায় ভাগাভাগি কাড়াকাড়ি,
হাত ধ'রে ছোটে মাঠ পাড়ি বন পাড়ি—
দোল খায় গাছে, নদী নেয়ে একসাথে
চাঁদের আলোয় গান গায় মাঝরাতে।

এমনি যায় কত দিন। শেষে একদিন
কথা পৌঁছল খোদ বিধাতার কানে,
নাছোড় বন্ধু কারা নাকি ওইখানে?
যে দেশে কেবল রাগারাগি মারামারি,
তিনটে পশুর সেথা নাকি মিল ভারি?
"তা হলে দেখি তো গিয়ে—" ব'লে,
বিধাতা এলেম বুড়োসুড়ো বেশ ধরে
"খিদেয় মরছি, খাওয়া দেখি ভালো ক'রে!"
খিদেয় মরছ?
ও মা! খিদে পেলে যায় নাকি তাতে মরা?
হনুমান পেড়ে নিয়েলো জামের ছড়া।
"এতে পেট ভরে?" ভরে যে, তা বলছে কে?
শেয়াল আনল মাছ ধরে সোঁতা থেকে।
"এতটুকু মাছ? এ কি খাওয়া? না,উপোস?"
ওকে বলো তবে, ওই হোথা খরগোশ।
আর খরগোশ? এমনি কুঁড়ের কুঁড়ে,
যত বলো, খালি বেড়ায় সে ঘুরে ঘুরে।
খালি ঘুরে বেড়ায় এদিকে সেদিকে, চোখ নেই ঘরে অতিথ, অতিথি দেবতা।
"এ কেমনধারা?" রেগে ওঠে হনুমান,
যা তবে জ্বালানি ভাঙ গিয়ে, বয়ে আন!
এ কোন্ ব্যাভার? শেয়াল চেঁচায়: "কাঠে
আগুন জ্বেলে দে!" জ্ব'লে ওঠে লহমাতে।
"আরো ঢাল কাঠ!" যত ঢালে, ধুধুকার
আগুন উঠছে রাঙা করে চার ধার।
আর-সে তখুনি ঝাপটে দুজনে মিলে
তারই মাঝে তাকে আচমকা ছুঁড়ে দিলে—

নুনে-ঝালে জারা মাংসের ভরা পাত
চেটেপুটে খেয়ে, ও মা! সে লোক হঠাৎ
চুড়োধারী হয়ে দাঁড়িয়ে, স্বরূপ ধ'রে।
ভয়ে দুটো পশু হটে যায়, করজোড়ে
বলছে: "ঠাকুর, বর দাও, যেন পাই
দুজনাতে শত বচ্ছর পরমাই—"
আর বিধাতাপুরুষ তখন
তিনি খালি দয়াচোখে চেয়ে এক ডাকে
জীয়ে তুললেন মরা খরগোশটাকে।
সাথে করে তাকে নিয়ে চললেন শেষে।
এখনও সে দেখ রয়েছে চাঁদের দেশে।
চাঁদনীতে দেখ ছুটে ফেরে চার পাশে।
আজও কি আপন দেশে চায় নেমে আসে?
কান খাড়া করে শোনে আজও, দেশ-গাঁয়
পিঠে গড়বার ধান ভানে কে কোথায়?



পাহাড়ের দেবতা

অন্ধ কবি, চারণ-কবি, পুরাকালের কত গল্প যে সে পালা বেঁধেছে। সাধু হয়ে গান গেয়ে ঘোরে এক গাঁয়ে আর গাঁয়ে। একদিন ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে গেছে, চৌতারা যন্ত্রখানা ঝোলার ভেতর থেকে পিঠে ঘা খেয়ে পড়ছে রাস্তায়— নির্ঘাত পথ হারিয়ে গেছে, কোথায় যে যাচ্ছে দিক করতে পারে না কিছুতেই। শুধু মালুম হয় রাত বাড়ছে— ঝাঁ ঝাঁ করছে রাতের পোকাপতঙ্গ, চড়াই ভাঙতে ভাঙতে সে কাতর হয়ে পড়ল। তখন একটা বড়ো মহীরুহ গাছের নিশানা বুঝতে পেয়ে সে গাছের নীচে গিয়ে নামাল ঝোলাটা। এই গাছতলাতেই রাতটা কাটিয়ে দেয়া যাবে, ভালোই হল। মনে ক'রে, শোয়ার আগে পাহাড়চুড়োর মুখো মুখ করে দাঁড়িয়ে তখন সে বলছে: "পথ হারিয়ে ফেলেছি দেবতা। রাতও হয়েছে। তোমার শান্তির ব্যাঘাত হবে তাও এখানেই রাতটা কাটাব ঠাকুর, অপরাধ নিয়ো না। শুতে যাবার আগে তা হলে চারণ-কবির একখানা গান তোমার শোনাই।" ব'লে, সে হাইকে-র গাথা থেকে একখানা পালা মনপ্রাণ দিয়ে গাইলে খানিকক্ষণ তার চৌতারা বাজিয়ে বাজিয়ে।

গান শেষ হয়েছে, যন্ত্রখানা রাখবে ঢুকিয়ে, হঠাৎ শোনে অন্ধকারে

মাথার ওপর থেকে কে যেন বলছে, "চমৎকার! চমৎকার! আরেকখানা গাও তো দেখি পালা?"

কে বলে? ঘা পড়ল যেন বুকখানাতে।

অবাক কাণ্ড! আরো কে আবার রয়েছে এখানে? থাক গে যে থাক! অবাক লাগলেও কোন্‌জাকু-র পুরাণ থেকে আরেকখানা পালা সে শুরু করলে।

শেষ হতে, অন্ধকার ওপার থেকে আবার সেই গলা: "সুন্দর হয়েছে। ভারি ক্লান্ত হয়ে গেছ দেখছি— যাও, জিরোও এবার।"

অবাক কাণ্ড, কথা শেষ না হতেই অজানা লোকের পায়ের শব্দ বেজে উঠল অন্ধকারে। কে যেন আসছে নীচদিক থেকে। সেই সঙ্গে কত্ত হরেক খাবারের সুগন্ধ। কে যেন খাবার ভর্তি থালা এনে রাখল সামনে ঠঙ্‌ করে। তারপর বলছে, "খেয়ে নাও।"

অবাক কাণ্ড! এ সব আবার কী? হোক গে যা হোক। খিদে পেট ভর্তি। খাবারের গন্ধে চন্‌মন্‌ করছে আশপাশ। কিছু আর না ভেবে চেটেপুটে খেয়ে শান্তি হয়ে পাহাড়চুড়োর মুখো তাকিয়ে হাঁটু গেড়ে হাত জোড় ক'রে প্রণাম করল এবার সে দেবতাকে। তারপর শুয়ে পড়ল টান হয়ে, নিশ্চিন্তি।

পরদিন ঘুম ভেঙে জাগতে না জাগতে এসেছে এক শিকারী। এসে বলছে, "লোকালয়ে তোমায় নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে গো! ভালো করে চেপে ধরো দেখি পিঠের এই তীরের টুকরিখানা! এসো পেছনে পেছনে।" ব'লে, সে হাতে যেটা ধরিয়ে দিলে সেটা যেন নরম পাট-চামরের মতো হাতে লাগে। যাক গে! ভাবনা-বিচার ছেড়ে সেটাই মুঠো করে ধরে সে নাবতে শুরু করল লোকটার পেছনে।

একটু যেতেই একটা পাহাড়ী নদী কলকল করে উঠল পাথর-ঘষা খেয়ে। আরটু যেতেই কুকুর-ডাক শোনা গেল। আরো খানিক গিয়ে মুরগি ক্যাচম্যাচ, ছেলেদের দৌড়ঝাঁপ, লোকজনের কথাকথি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অদূরের কোণা দিয়ে একটা ছেলে যেন চেঁচিয়ে উঠল দলের মধ্যে থেকে—

"দেখ্, ওই দেখ্, নেকড়ের লেজ ধরে নাবছে একটা লোক! ও মা! অন্ধ নাকি লোকটা? দেখ্—"

যে মুহূর্তে বলেছে, শিকারী যে সাথে করে আনছিল কবিকে, নিমিষে তীরের টুকরি টান দিয়ে হাত খুলে নিয়ে যে পথে আসছিল সেই পথেই ওপরমুখো ছুট— দে ছুট—

অন্ধ কবি টাল খেয়ে বসে পড়ল সেইখানেই।

একটু পর ঘেসেড়া একটা লোককে পেয়ে সে বললে, "মোড়লের বাড়ি চেনো?"

"গাঁয়ের মোড়ল? যাবে সেখানে তুমি? তো চলো।" ব'লে, ঘেসেড়া তাকে নিয়েলো গাঁয়ের মধ্যে।

সেখানে ছেলেদের কাছে শোনে, ও মা! সে নাকি নাবছিল একটা নেকড়ে বাঘের লেজ ধরে!

সত্যি কথা?

কাল রাত থেকে পর-পর ঘটনা সব মোড়লকে বলতে মোড়ল চেঁচিয়ে উঠল হাততালি দিয়ে: "এই দেখ! এইবার ঠিক হয়েছে। তখুনি ভেবেছি—"

কী কাণ্ড! ব'লে, সে বলে: "কাল রাতে আমার ছোটো ছেলেটা হঠাৎ ঘোর খেয়ে বলে কী, না আমি পাহাড়ের দেবতা, শোনো—"

"হাসি নয়। শুনছি ভয়ে ব'সে। ও মা! গলাখানা থমথম করছে বড়োমানুষের গলার মতন— বলে কী, না আমি পাহাড়ের দেবতা, আজ আমার বাড়ি মানী অতিথি এয়েছেন, এখুনি ভালো খাওয়া-দাওয়া পাকিয়ে বানিয়ে দিয়েসো তো ওপরের অমুক গাছতলায়! অতিথকে খাইয়ে এস যত্ন করে—

"ও বাবা! এমনি কাণ্ডও হয়!"

যা হোক, তখুনি তো বাড়ি হৈচৈ করে যা পারি রাঁধাবাড়া করিয়ে

নিজেই দিয়েলুম গিয়ে— লোক যে কে, তা দেখিও নি ছাই অন্ধকারে!

"তুমিই তবে সে পাহাড়দেবতার কালকে রাতের অতিথ? বাব্বা! তোমার বাজনার জোর আছে বটে!"

ব'লে, সেবা যত্ন করে বসে বসে শুনলে পুরোনো রাজারাজড়ার দেবদেবতার এক-একখানা গা-তাতিয়ে তোলা, মন-পুড়িয়ে-দেয়া পালা।

"চমৎকার! ভারি ভালো গান বাঁধো তো তুমি, বাবা! থাকো, এখানেই ঘর বেঁধে দি একখানা, থাকো। সারা গাঁয়ের মান্যি অতিথ হয়ে থেকে যাও বাবা, কাজ কী আর অকারণ হেথাসেথা চ'লে বেড়িয়ে?"

যেদিন ঘর বেঁধে তাকে থিতু করে বসিয়েছে, তার পরদিন ভোর-সক্কালেই দেখে অতিথ তার ঘরখানা ফাঁকা করে চলে গেছে।





কথা রাখা

উগেৎসু মোনোগাতারির সংকলনে রয়েছে এই গল্প।

"দেরি করব না। ভাবিস নে, শরৎ পড়লেই— তার গোড়াতেই দেখিস, ঠিক ফিরব।"

অনেক দিন আগের কথা। আকানা বলছিল তার ছোটো ভাই, সৎমায়ের ছেলে হাসেবেকে। হাসেবে বড্ডই নেওটা তার দাদার, আকানাও তাকে প্রাণের চাইতে ভালোবাসে।

তখন বসন্তকাল। হারিমা দেশের কাতো গাঁয়ে থাকে আকানারা। কিন্তু সে হল ইজুমো সামুরাই, বাপ মরার পর কাতোয় এসে আছে সৎমায়ের ঘরে— ঘরের কর্তা হয়ে, সৎমাও যেন তাকে চোখের আড় করতে পারে না। কিন্তু তার আপন ঘর ইজুমোতে, ইজুমোতেই তার জন্ম আর এতগুনো দিন কেটেছে, বাপঘরের পরিজনেরাও আছে সেখানেই। কত দিন দেখে নি তাদের, জন্মদেশটার বাইরে হয়ে আছে কত দিন। একবার গিয়ে দেখে আসার জন্যে মন তার ছটফট করছিল অনেক দিন ধরে।

হাসেবে বললে, "কিন্তু ইজুমো কি এখানে? সে তো অনেক দূর! ঠিক সেদিনেই ফিরবে বলে কী করে কথা দিচ্ছ আগের থেকে?"

তার মাও ছেলের কথায় জোড়া দিয়ে বলে, ‘ইজুমো হল আটটা মেঘ উদয়ের দেশ, আমরা বলি উন্‌শূ দেশ। সে কি সোজা পথ?”

হাসেবে আবার বলে ওঠে, “যাই হোক ঠিক ঠিক দিনে ফেরো তো· দেখো সেদিনে একটা ভোজের যোগাড় করে রাখব। এগিয়ে আনবার জন্যে গাঁয়ের ওই শেষটাতে দাঁড়িয়েও থাকব গিয়ে নিশ্চয়।”

“ঠিক ফিরব রে, তুই ভাবছিস কেন! কত ঘোরাঘুরি করি, দেখিস তো? একটা জায়গাতে যেতে-আসতে কত দিন লাগে তার ঘন্টা-মিনিট সুদ্ধু হিসেব আছে আমার। দেখিস তুই! আচ্ছা তোকে বলেই যাচ্ছি ঠিক কবে ফিরব—” বলে সে খানিকক্ষণ কী গুনলে মনে মনে, তারপর বললে, “হ্যাঁ সেই ঠিক। মনে কর্, ফিরব শরৎ মাস পড়লে পর ঠিক তার চোয়ো পরবের দিনে। মনে থাকবে?”

হাসেবে বলে, “মনে থাকবে না? সে হল চন্দ্রমল্লিকার সময়। মাঠ ভরে ফুটে থাকবে চন্দ্রমল্লিকা। ভালোই হল, এক সাথে দেখতে বেরোবো দুজনে।

“কিন্তু মনে রেখো মাসের ন তারিখ পড়বে সেদিনে। খেয়াল থাকবে তো?”

মা বলে, “অত দূরের পথ। দিন ক্ষণ অমন ঠিক-ঠিক মেলে?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ চোয়ো পরব তো সেদিনে। মিলবে না?” হেসে উঠল আকানা সোয়েমোন। তারপর মায়ের হাত দুটো মুঠোয় ধরে, হাসেবের পিঠে হাত বুলিয়ে সে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠল তার ঘোড়াটাতে। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল তখুনি আর পিছনে না চেয়ে।

হাসেবে আর তার মা অশ্রুচোখে চেয়ে রইল তার যাওয়ার দিকে।

পুরোনো জাপানী প্রবাদে বলে, সূর্য বা চাঁদ একবারের মনেও কেউ তাদের ঘোরা থামায় না। কাজেই দিন কাটতে লাগল সমানেই। তার ভেতর কবে ফুরিয়ে গেল বসন্ত, পরের পর আরো দুটো দুটো ঋতু— তারপর দিনের আলোর দিকে চেয়েই বুকটা হঠাৎ বেজে ওঠে, শরৎ এসে পড়ল তা হলে।

শরৎ হল চন্দ্রমল্লিকার ঋতু। তার প্রথম ন তারিখে পড়ছে চোয়ো পরব। মনে হতেই হাসেবে একখানা ভরপুর আয়োজনের যোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ভাইয়ের জন্যে ঘর সাজাল নতুন কলি ফিরিয়ে। চন্দ্রমল্লিকার ঝাড় আনল কুলুঙ্গিতে ফুলদানি সাজাবার জন্যে, খাবার আনল যত ভালো ভালো সব পদ মেলে হাটে দোকানে মিঠাই-কারিগরের ভিয়েনে। মা দেখে বলে, "কিসের এত তোড়জোড় রে হাসেবে?"

"দাদা বলে গেছে না, আসবে ন তারিখের দিনে? মনে নেই?"

"এত ছটফট করছিস সেই কথার দেখতাই? জানিস নে ইজুমো এখান থেকে একশো রি-র (এক রি হল চার কিলোমিটার) বেশি দূর? পাহাড়ী রাস্তা, ঘোড়া চালানো কঠিন, তার উপরে রাতে দস্যু-বাটপাড়ের উপদ্রব। এত নিশ্চয় হলি কী করে যে ঠিক ন তারিখের দিনেই এসে পৌঁছতে পারবে আকানা? আগে এসে পৌঁছোক, গোছ করতে কত সময় লাগে! এখন এই ফুল শুকোবে, খাবার বাসী হতে থাকবে অকারণ—"

হাসেবে বলে, "আকানাকে তো তুমি জানো মা। কখনও নড়চড় হয় না তার কথা। সে যদি এসে দেখে আয়োজন কিছু নেই, কী ভাববে সে? ভাববে তার কথাতে সন্দেহ করেছি আমরা। তখন লজ্জা পাব।"

ঝলমলে সুন্দর দিন। এক ফোঁটা মেঘ নেই আকাশে। হাওয়া এত স্বচ্ছ যে দুনিয়াটা আরো হাজার গুণ বড়ো লাগছে। হাসেবে সকাল থেকে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দূরের মোড়টাতে।

কত পথিক সোয়ারী তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে, সামুরাইও তাদের কেউ কেউ। দূর থেকে যাকেই আসতে দেখে সোয়ারী, মনে হয় বুঝি আকানাই, হাসেবে চঞ্চল হয়ে ওঠে। সময় যাচ্ছে একটু একটু করে। দুপুরের ঘন্টা বেজে গেল গাঁয়ের মন্দিরে। বেলা পড়ে এল ধীরে ধীরে। হাসেবে তখনও একদৃষ্টে দূরে চেয়ে আছে। সূর্য ডুবে গেল। ছায়া ঘোর করে আসছে। না, আকানার দেখা নেই তখনও। হাসেবেও ঠায় দাঁড়িয়ে, তার চোখদুটো জ্বলছে তখন। মা উজিয়ে এসেছে ঘর থেকে, "এবারে ঘরে চল্ বাবা।"

"তুমি যাও মা। তোমার শরীর ভালো নেই। খেয়ে নাও গিয়ে।"

মা বলে, "রাত ঢের হল হাসেবে। মান্ষের মন হল শরৎ কালের আকাশ, ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়। কিন্তু তোর আনা অত ফুল কালও তো তাজা থাক্বে, কাল সকালে নয় ফের এসে দাঁড়াস দাদাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।"

হাসেবে বলে, "তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো গিয়ে মা। আমি থাকি আর একটুখানিক।" ব'লে হাসেবে দাঁড়িয়েই রইল সেইভাবে। মা বলল, "তবে তুমি থাকো, দোর খোলা থাকবে, আমি গিয়ে শুই আমার ঘরে।"

মা চলে গেল।

রাতটাও দিনেরই মতো ঝলমলে সেদিনে। গোটা আকাশটা বিজিবিজি তারায় ছেয়ে গেছে। স্বর্গের সেই টানা সাদা নদীটা যেন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। নিস্তব্ধ হয়ে গেছে চারি ধার ততক্ষণে। দূরের সেই ছোটো নদীটার একটানা গুঞ্জন, চাষিঘরের কুকুর-ডাকে স্তব্ধতা ভেঙে যাচ্ছে এক-একবার। হাসেবে দাঁড়িয়েই আছে পাথরের মূর্তির মতো একভাবে। রোগা পাঁচ কলা চাঁদ

পাশের পাহাড়টার আড়ালে হারিয়ে গেল আর চরাচরে আলগা হয়ে বিছিয়ে গেল আরো এক-পরতা অন্ধকার— আর তখনই তার মনটাতে অজানা আশঙ্কার একটা ঘা বেজে উঠল হঠাৎ। বুকে কেমন যেন ঠাণ্ডা উঠতে থাকে ভয়ে, নাঃ, ভয়ই হচ্ছে, হাসবে ভাবলে, আর থেকে লাভ নেই। সে ফেরারই উপক্রম করলে। আর, সবে পথটুকু পেরিয়ে বাগানের ফটকগোড়ার মুখে এসেছে, হঠাৎ পিছু ফিরে দেখে দূর দিয়ে কে একটা লোক আসছে না? দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তি যেন— কিন্তু না, ঘোড়া নেই, ছুটেই আসছে, তারপরই মনে হয়, না ছুটেও তো নয়, যেন ভেসে আসছে— প্রায় হাওয়াবেগে, দেখতে দেখতে কাছে এসে পড়ল—

না চিনতে আর ভুল হচ্ছে না—

আকানা।

"দাদা? যাক! পেরেছ আসতে? বড্ড দেরি হয়ে গেল। হোক গে, চলো চলো—" ব'লে হাসেবে এগিয়ে যায় আকানার দিকে। "সেই সক্কাল থেকে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম মোড়টাতে— সারাদিন— ভাবলুম আর বোধ হয় আসা হল না আজ— যাক! কিন্তু সত্যি তো তুমি কথা রাখতে পারলে শেষ পর্যন্ত। যাক, চলো চলো—" বলে বাগানের ফটকটা সে খুলে দেয় টেনে— পরক্ষণেই খেয়াল হয় যেন, "এ কী! ঘোড়া কই? হেঁটে আসছ অদ্দূর থেকে? হেঁটে তো নয়। দেখলুম ছুটে আসছ— ইশ্! বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে— চলো, ঢোকো ভেতরে। নেয়ে ধুয়ে ফিট হয়ে একটু জিরোও বসে। তারপর আমি আনি সব, খাবার যোগাড় দেখি আস্তে আস্তে—"

ব'লে ঘরে ঢুকে কমে-আসা আলো-কটা উসকে দিতে থাকে হাসেবে পর পর— "মা এতক্ষণ অপেক্ষা করে করে অস্থির হয়ে পড়েছিল। জোর করে শুতে পাঠালুম ঘরে— নাও আগে এই সরবতটুকু ধরো তো। আগে ঠাণ্ডা হও দু দণ্ড জিরিয়ে। তারপর নেয়ে ধুয়ে শান্তমতন এসে বোসো—" ঠাণ্ডা সরবতের গেলাশটা হাসেবে রাখল নিয়ে সামনে, তারপর খাবারগুনো গরম করতে চাপিয়ে দিতে লাগল ফের একে একে।

আকানা কিন্তু সে জল স্পর্শ করল না। খাবারের দিকে, ঘরের আলো আর ফুলের দিকেও ফিরে চাইল না। নাওয়া ধোয়ারও কোনো উদ্যোগ দেখা গেল না তার। শুধু নীরব নিশ্চল হয়ে বসে রইল সে একটুক্ষণ। তারপর বোধ হয় মাকে জাগিয়ে দেবে ভয়ে খুব নিচুগলায় প্রায় নিঃশব্দে বলতে লাগল ধীরে ধীরে—

"দেরি হয়েই গেল রে! কিন্তু কেন দেরি হল তোকে খুলে বলা দরকার, শোন্ তবে।

'ইজুমোতে গিয়ে দেখি আগের রাজা এনিয়া-র দয়া-ধর্মের কথা লোকে ভুলে গেছে, আর ষড় করে রাজাকে উৎখাত করে টোণ্ডা দুর্গের যে দখল নিল গিয়ে, মূর্তিমান পাপ সেই সুনেহিসা-র অনুকম্পা যেচে ফিরছে সব দিবারাত্র। জানিস তো, আমার জ্যেঠতুতো দাদা আকানা তান্‌জি-র কী রকম টান দিল আমার 'পরে, আমাকে সে আসতে দিতেই চায় নি ওদের ছেড়ে। আমারও মনটা টানে সবসময় তার দিকে। গিয়ে দেখি সুনেহিসা-র সে পরম প্রিয়পাত্র, দুর্গরক্ষীদের প্রধান পদে বহাল নিয়ে দুর্গের নীচেই থাকে আলাদা মহলাতে। আর আমায় পেয়ে তো সে মহা খুশি। যেতেই বলে, চল্ আগে রাজাকে প্রণাম জানিয়ে আসি। সে-ই নিজে নানা সামিগ্রি ভেট সাজিয়ে নিলে রাজার প্রণামী বলে, গেলুম দুজনে মিলে। কিন্তু গেলুম শুধু লোকটাকে নিজে চক্ষে ভালো করে দেখব বুঝব বলে। আগে তো মুখটাও কখনও দেখি নি।

"এখন সামনে দাঁড়িয়ে দেখি শাণানো তরোয়ালবাজের মতো চেহারা, মুখে-চোখে অকুতোভয় ফুটে বেরোচ্ছে। চোখদুটোতে নজর করে দেখি নিষ্ঠুর শয়তানের ঠাণ্ডা চোখ। সে ভাবলে বুঝি প্রার্থী হয়ে এসেছি। আমারও মনে হল সোজা জানিয়ে দেয়াই ভালো, তার চাকরিতে আমি ঢুকব না। সে জন্যে আসি নি। এসেছি ভাইয়ের সঙ্গে, তার মান্য রাখতে। কিন্তু ফিরে এসে দেখি তারই মধ্যে রাজার আদেশ হয়ে গেছে আমায় ঘরবন্দী করে রাখার, বেরোতে না দেয়ার। ভাইকে বললাম, তুমি তো আমার ভাই। তা

বাদে কথা দিয়েসেছি শরৎ পড়লে সে মাসের ন তারিখে ঠিক পৌঁছব আমি হারিমাতে। আমায় কিন্তু ফিরতেই হবে সময়মতো।

"কিন্তু অনুমতিও মেলে না, ফাঁকও মেলে না। তখন ভাবলাম, পালাব। পালাব রাতের অন্ধকারে, দুর্গপুরী ঘুমিয়ে নিঃসাড়া হয়ে যাবার পর। ছায়া হয়ে গা ঢেকে বেরোতে গিয়েও দেখি চারি ধারের সজাগ পাহারা আমায় ঘিরে। পালাবারও ছিদ্রটুকু নেই কোনোখানে। আজ এই এতক্ষণেও যে আসতে পারলাম, এর আগের মুহূর্ত অবধি কোনোই সুযোগ করতে পারি নি ব'লে।"

আকানা থামল প্রায় এক দমে এতখানি কথা ব'লে ফেলার পরে। আর থামা মাত্রই ছাঁৎ করে উঠল কথা-কটা আরেকবার মনে ভেবে। আজ? আজকের আগের মুহূর্ত অবধি? তার মানে? হাসেবে বিভ্রান্তের মতো মনে মনে বিড়বিড় করে উঠল, কিন্তু টোগুা দুর্গ তো এখান থেকে একশো রি-র চাইতেও বেশি দূর!

আকানা থেমে থেমে আরো অস্ফুটে তখন বলছে, "হ্যাঁ, আর জানি কোনো মানুষ এক দিনে পায়ে হেঁটে একশো রি রাস্তা পেরোতে পারে না। কিন্তু আমি ভাবলাম, যদি কথা না রাখতে পারি, কেউ তো তা ঠিকভাবে নেবে না; মা ভাববে, তুইও ভাববি, অছিলা, কথা ফেরাবার অছিলা। তখন সেই পুরোনো প্রবাদটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল : লোকে না পারুক, তারা আত্মা তো চলতে পারে দিন না হোক হাজার রি পথ (তামা য়োকু ইচি নিচি নি সেন রি উয়ো য়ুকু)। ভাগ্যে তরোয়ালখানা কেড়ে নেয়া হয় নি আমার। হ্যাঁ, শুধু তারই জোরে এসে পৌঁছতে পারলাম শেষ অবধি।"

তারপর "মাকে দেখাশোনা করিস ঠিক মতো, অবহেলা না হয়।" এই কথা-কটা বলতে বলতেই সে উঠে দাঁড়িয়েছে, আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মুহূর্তে মিলিয়ে গেল হাওয়াবাতাসে।

তখন হাসেবে বুঝতে পারল, কথা না ভাঙতে শেষ পর্যন্ত আত্মঘাত করেছে আকানা।

পরদিনে কাকভোরে উঠে হাসেবে টোণ্ডা দুর্গের দিকে রওনা হয়ে গেল।

মাৎসুয়েতে পৌঁছে সে শুনতে পেলে টোণ্ডা দুর্গের রক্ষীপ্রধান আকানা তান্‌জির দুর্গতলার বাড়ির উঠোনে তার খুড়তুতো ভাই আকানা সোয়েমোন হারাকিরি করেছে গতকাল। মাৎসুয়েতে না থেমে হাসেবে সোজা ঢুকল গিয়ে দুর্গ-ঘেরোয়ার ভেতরে। তারপর পাথরের মস্ত চত্বর পার হয়ে আকানা তান্‌জি-র ভেতর-উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে তাকে ঘরের বার করে আনল, কঠোরভাবে চোখে চোখ রেখে বলল, "আকানা কোথায়? আকানা সোয়েমোন?"

হঠাতে সে এমনই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে যে শব্দ করতে পারে না।

"কই, বলো?" এগিয়ে গিয়ে বুকের জামাটা চেপে ধরল সে খপ্ করে।

উত্তর নেই। কিন্তু হাসেবের ঝাঁঝ চড়া গলাতে লোক দাঁড়িয়ে গেছে এসে আশেপাশে।

আর ঠাণ্ডা গলাতে হাসেবে তখন বলছে, "বিশ্বাস রাখো নি তুমি ভাইয়ের সঙ্গে, তাই তো?"

বলেই, আর মুহূর্ত সময় না দিয়ে সবার চোখের উপরেই খাপের অসি নিষ্কোষ করে আমূল বিঁধিয়ে দিল আকানা তান্‌জি-র বুকে, দ্রুত হাতে।

তারপর কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগে হতচকিত লোকগুনোর সপাট সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল দুর্গ-ঘেরোয়ার বাইরে, ঝটিতি উঠে ঘোড়া চালিয়ে দিল ফেরা পথে। কেউ তার গায়ে আঁচড়টুকু কাটতে পারল না।

মহামান্য সুনেহিসার কানে কথা গিয়ে পৌঁছেছিল সাথে-সাথেই। কিন্তু তিনি আদেশ দিলেন, কেউ না পিছু ধাওয়া করে হাসেবের। যদিও চরম নিষ্ঠুর, তবু সত্যকে শ্রদ্ধা করার একটা গুণ ছিল লোকটার। আকানার উপরে রাগতে পারেন নি, হাসেবেও হারিমাতে ফিরে এল নিরাপদে।



ফুজি পাহাড়

সুরুগা, কাই আর তোতোমি— তিন রাজ্যের একশো মাইল বেড় দিয়ে ১২,৩৮৮ ফুট (৩৭৭৬ মিটার) উঠেছে ফুজি সান, ফুজি পাহাড়, ফুজি য়ামা— তোকিয়ো শহরের ৬০ মাইল (১০০কি.মি.) দক্ষিণ-পশ্চিমে, জাপানের সবচেয়ে উঁচু সবচেয়ে সুন্দর পাহাড়, জাতীয় পর্বত। লোকে বলে, ফুজি পাহাড় আর বিওয়া সরোবরের সৃষ্টি পঞ্চম বছরের ষষ্ঠ মাসে (জাপানে দিন গোনা এই ধারাতেই), অর্থাৎ ২৮৫ খৃষ্টপূর্বাব্দের গরমি জুনের দিনে, সম্রাট কোয়েইয়ের রাজত্বকালে। মূলে সে হল আগুনপাহাড়, ৭৮১ সালে প্রথম আগুন তুলেছিল, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত পনরবার বড়োরকম অগ্ন্যুদ্‌গার করে ১৭০৭ থেকে জুড়িয়ে আছে (১৭০৭এর অগ্ন্যুদ্‌গারে তোকিয়ো শহরও ছ ইঞ্চি পুরু ছাইয়ে ছেয়ে গিয়েছিল)— এখন হালকা রেশমি বাষ্পের ধোঁয়া তোলে খালি মাঝে মাঝে।

আগের লোকেরা বলতেন, আগুনগিরির উদ্ভব হয় সাগরের সব জঞ্জাল জ্বালিয়ে উগরে ছাই করে দেওয়ার জন্যে, তার জ্বালামুখ চলে গেছে সমুদ্রপাতালের মেঝে পর্যন্ত। ফুজির সম্বন্ধ তবু পাতালের চাইতে বেশি স্বর্গের সাথে। পুঞ্জ মেঘের ওপর দিয়ে অশরীরী দেবাত্মার মতো ভাসতে

থাকে তার চুড়ো, কখনও আকাশনীলিমার গায়ে দাগলেশহীন রুপোলি সাদা চুড়ো তুলে সে দাঁড়িয়ে থাকে চিরজীবী দেবতার মতো। হাজার বছরের ওপর ধরে পুণ্যার্থী যাত্রীরা চলেছে ফুজি পাহাড়ের তীর্থশিখরে— সে মোটে জুলাই-অগস্টের দুটো মাস, বছরের দশ মাস সে আছে বরফের উড়ুনি জড়িয়ে। অগম্য।

শোভার তুলনা নেই ফুজি য়ামার। সে নাকি মিনিটে মিনিটে রূপ বদলায়, কখনও দু বার তাকে একরকম দেখায় না। যুগে যুগে কত কবি শিল্পী পঞ্চমুখ হয়েছেন তার বর্ণনাতে। শিল্পী হোকুসাই রঙ দিয়ে এঁকেছেন তার ছত্রিশ ধারা দৃশ্যবদলের ছবি। কটি তার লেখা জাপানের পুরোনো কবিতার সংগ্রহ আর আধুনিক কবির লেখা থেকে এখানে তরজমা করে দিলাম।

১

যেদিন দু ভাগ হয়ে
স্বর্গ মর্ত্য ছিঁড়ল দুটো- দু ধার
যেন সে রাজাধিরাজ,
দেবতার মতো আজ,
সুরুগা ভূমির 'পরে
চুড়ো উঁচু করে দাঁড়াল ফুজি পাহাড়।

চেয়ে দেখি চোখ ভ'রে
স্বর্গের ওই পারহারা প্রান্তরে
গগন-ভাসানো অরুণের অত আলো
ঢাকল সে, মাঠ হয়ে গেল ছায়া-কালো!
চাঁদের উজোর দীপালি— জ্যোৎস্নাভার,
ছায়া হয়ে গেল ছায়ায় ছায়ায় তার।
দেখি ছিঁড়েখুঁড়ে নামিয়ে দিল সে

পথ থেকে অকাতরে
চলছিল যত দলবাঁধা মেঘ
সাদা-কালো সাজ প'রে।
যেন সে সময়সীমানা পেরিয়ে
একটানা শুভ্রালি
বরফ পড়ছে বরফ পড়ছে খালি।

এই কথাটাই বলব যেটুকু পারি।
চিরদিনকার লোকেদের কাছে
বলে যাব বারবারই:
দেখ, দেখে যাও, চোখ ভ'রে দেখ,
দু চোখ প্রমাণ পুরো,
দেখ নভ-ছোঁয়া ফুজির পাহাড়চুড়ো।

অনুবন্ধ

তাগো-র খিলানের নীচ বেয়ে
বেরিয়ে এলাম, দেখছি সাদা
যত দূর চাই শুধু হিমানী বরফ
ফুজির উচল চুড়ো ছেয়ে।

য়ামাবে আকাহিতো, 'মানিয়োশূ'।

২

কাই দেশ আর সুরুগার
মাঝখানে
যেখানে কেবলই ঢেউ ওঠে, ঢেউ ভাঙে,
তারই 'পরে স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে

উচল ফুজিশিখর;
যত আসে মেঘ, দেয় পর পর
সরিয়ে নিরন্তর।
দূর-ওড়া পাখি— তারাও পারে না
সে চুড়োয় পৌঁছতে
দম ভরা বুকে, ভরা বাতাসের স্রোতে।

বরফ সেখানে আগুনে আগুনে ডোবা—
আগুন সেখানে বরফ গলানো শোভা—
কী যে বলি, কোন্ ডাকে
ডাকি বলো এই রহস্যময়
জাদুকর দেবতাকে!
ছায়া ঢাকা জল অনাদি অতল
সে যেন অপার জল খালি জল,
'সে' সাগর বলে যাকে।
যে 'ফুজি' উজিয়ে লোক জোটে গিয়ে
পাহাড়ের নীচটাতে—
সে যে ধারানদী, বয়ে যায় দিনে রাতে।
যে দেবতা বাস করেন হোথায়, যাঁর
অভয় কবচ আগলে রয়েছে আজ-কতদিনকার
অকূল আলোর জ্যোতিষ্ক সূর্যকে,
রক্ষা করছে য়ামাতো দেশ আর
ওই গিরিরত্নকে!

চেয়ে থাকি অপলকে
সুরুগা-র ফুজি-চুড়োর সুদূরে—
ক্লান্তি আসে না চোখে!

অনুবন্ধ

আঝরা বরফ, আঝরা বরফ,
ফুজি-র শিখরে
অবিরাম গ'লে পড়ে,
ছ-মাসের মাস পনেরোর দিন এলে
ফের বরফিনা হয়ে যাবে ব'লে
বরফে বরফ ঢেলে।

অতখানি উঁচু ফুজি-র চুড়োয়
স্বর্গের মেঘও ভয়ে ভয়ে ছোঁয়,
পথ ছেড়ে নেমে পড়ে,
মেঘরেশ হয়ে ঝুলে থাকে তারপরে।

'তাকাহাশি মুশিমারো' সংগ্রহ, 'মানিয়োশূ'।

৩

পায়ের গোড়ায় ধুলো জমে জমে
হিমগিরি ক্রমে
ফুজি—
সম্বচ্ছর রবিকর আর হিমানীর যোঝাযুঝি।

'ইজায়োই নিক্কি' থেকে।

৪

আগুন পাহাড়ের শিখা ওগো,
লাল ঠিকরে তুলছ বরফে।
শান্ত শিখা বরফের কাঁধে

ঠিকরে উঠছে, স্থির হয়ে
আকাশে দাঁড়িয়ে— ঘন ঘোর
রাতের মোমদানে দু পা গুঁজে।
দেখ, ঠিক মাথার উপরে,
একদম শীর্ষে— চাঁদের ওই
খোলা জায়গাটাতে— শঙ্খপাকে
পাক দিয়ে তুলছে নীল রশি।
কাছ হব যখন, কাছে গিয়ে
মহানাগ ড্রাগনকে শুধাব:
বলো, কেন দুনিয়ার পথ—
সব পথ— এত দুঃখে ভরা?
দেখো ওই ঘূর্ণি মেঘ আর
বেড় দিয়ে না ওঠে পাক খেয়ে!
তোমার ও সোনার আঁষ শুধু
শিখায় শিখায় ধরে উঠে
ছটা দিক— লুলা-লুলা-লা. . .
খর চোখ, ধারালো নখর
লুকোও, বুজিয়ে ফেল, দেখ
কিভাবে বেড় দেয় পাক খেয়ে—
লুলা-লুলা-লুলা-লুলা-লা. . .

কুসানো শিম্‌পেই, আধুনিক কবি।



চড়ুই আর কাঠঠোকরা

এক মায়ের দুই মেয়ে, দু বোন চড়ুই আর কাঠঠোকরা। শ্বশুরঘরে বসে হঠাৎ দুজন খবর পেল মা তাদের মৃত্যুশয্যায়।

ঠোঁটে মিশি মেখে তখন সাজছিল চড়ুই। শোনবামাত্র "থাক পড়ে!"— ব'লে পড়িমরি উড়ে পড়ল সে মাকে দেখতে।

দেখো, বেচারার আজও সাদা ফ্যাকফ্যাক করছে ওপর-ঠোঁট।

আর কাঠঠোকরা? সে তখন রঙ আর রূপটান মেখে নিপুণ ক'রে সাজতে বসেছে, সাজা শেষ হতে ঢের বাকি। আধসাজা মুখ নিয়ে বেরোনো যায়? মুখে গোলাপির আভা দিয়ে, চোখ কালো ক'রে, সাজ সেরে বেরোতে তার সময় লেগে গেল খানিকটা। পৌঁছে দেখে, অনেকক্ষণ আগেই মায়ের মৃত্যু হয়েছে।

তাইতে দেখতে যদিও খাটোখোটো পাঁচাপাঁচি, চড়ুই আজও লোকঘরের সুজন পড়শি। ছেলেপুলে নিয়ে খেয়ে-ফেলে দিব্বি সে আছে লোকজনের সঙ্গে মিলেমিশে। আর কাঠঠোকরা?

দেখতে যে অমন রূপসী, দেখো সেই কাঠঠোকরার ভাব নেই কিন্তু কারও সাথে। ভোর থেকে বনে বনে গাছের ডালে গুঁড়ির গায়ে ঠোঁটের ঘা দিয়ে দিয়ে সে ঘোরে খিদের জ্বালায়— সারাদিনে এইটুকু তিনটে পোকা তার

জোটে কি না সন্দেহ। রাত হলে গাছের কোটরে ঢুকে ঘা-খাওয়া ঠোঁটের জ্বালায় থেকে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে : ও আ এ—

ও আ এ— হাশিগা য়ামেরু দেয়া— ও আ এ—

ও রে রে— আমার ঠোঁট গেল রে, ঠোঁট গেল রে ব্যথায়—

ও রে রে—

ঠোঁটকাটা চড়ুই

পরবের দিনের পরমান্ন, ডেকটি নেবে জুড়োচ্ছে সবে— কোত্থেকে একটা চড়ুই এসে মুখ দিয়ে পড়েছে। আ মোলো যা! পোড়ার-মুখ চড়ুই! ব'লে হাতাখানা ছুঁড়ে মারল হেঁসেলঘরের গিন্নি, আর আচমকা লেগে চড়ুইয়ের ঠোঁটটা গেল কেটে, ঝটিৎ উঠে জানলা গলে সে ওড়া দিলে বটে কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না। ঝটপট করে পড়ল পাশের পড়শির বাগানে।

বাগানে সবজীর মাটি পাট দিচ্ছিল বুড়ো লোকটা, পাখিটাকে অমন পড়তে দেখে সে গিয়ে তুলল হাতে করে। আহা রে! ঠোঁটটা এমনি করে কাটল? কে মারল কে এমন করে? ব'লে সে জল এনে দিল মুখে, কী সব পাতালতা ছেঁচে রস বের করে পাতা পেঁচিয়ে বেঁধে দিল ঠোঁটের গোড়াটা, তারপর ঘরে নিয়ে কুলুঙ্গিতে নরম কাঁথা মুড়ে তাকে রেখে বললে, "থাক এখানে। যদ্দিন না সারে, যদ্দিন না গায়ে-পায়ে বল পাস, যাবি না কোত্থাও", বলে দিলুম।"

বুড়ো আর বুড়ির সংসার। দুজন মিলেই পড়ল পাখিটাকে নিয়ে। আর কদিনেই যত্নে সেবায় ভালো হয়ে গেল পাখি। সেরে যেতেই, ডানায় একটু বল পেতেই বুড়োবুড়ির সামনে উড়ে উড়ে বলে, "বাবা গো, মা

গো, ভালো হয়ে উঠলুম— এবার বলো তো ঘর যাই।”

“থাক না বাছা গরিবের ঘরে কটা দিন।”

বুড়োবুড়ির ছেলেপুলে নেই, চড়ুইকে পেয়ে তাদের ঘর যেন ভরাভর্তি, ছাড়তে মন সরে না।

চড়ুই থেকে গেল। বুড়োবুড়ির কাঁধে চেপে ঘোরে, কাঁধ থেকে গাছে উড়ে বসে, গাছ থেকে গাছে লুকোচুরি খেলে, কিচিমিচি কথা ব'লে ভরদিন ঝালাপালা করে বুড়োবুড়িকে। তারা ভাবে, আহা! পাখিটা মায়া করছে।

করুক। করছে বলেই তো ভালো লাগছে এত।

এমনি যেতে যেতে একদিন ভোরে উঠে বুড়ো হঠাৎ দেখে, চড়ুই তো ঘরে নেই। সাত-ভোরে আগেই বেরিয়ে গেছে ঘর ছেড়ে? যায় না তো। ওই তো ডাক দিয়ে দিয়ে তোলে বুড়োকে, তারপর কাঁধে চেপে বাইরে বেরোয়, সেখান থেকে ওড়া দিয়ে ঘুরতে থাকে এ গাছ সে গাছ। রাজ্যের পাখি জুটিয়ে আনে ডেকে ডেকে, মেলা বসিয়ে দেয় বুড়োর বাগানে। তো গেল কোথায়?

হবে, গেছে কোথাও আগেভাগে। আসবে এখুনি।

বুড়ি উঠে বলে, “চড়ুই গেল কোথায়?”

“গেছে কোথাও। আসবে এখুনি।”

এখুনি আসবে, এখুনি আসবে ক'রে সকাল দুপুর বিকেল গড়িয়ে গেল, সন্ধ্যে হয়। পাখি ফিরল না।

তো সত্যি, গেল কোথায়?

রাতটা ভারি অশান্তিতে বেঘুমে কাটল বুড়োবুড়ির।

সক্কালে উঠে বুড়ো বলে, যাই, খোঁজ করে দেখি কোথাও আটকা পড়ল কি না।

ব'লে সে প্রত্যেকটা ঝাড়ঝোপ গাছপালা খুঁজে খুঁজে পাড়া ছাড়িয়ে গাঁ ছাড়িয়ে পড়ল— পাখির লেখা কোথাও নেই। বনপথে যেতে যেতে

দুপুর হয়ে গেল, বেলা থমথম করছে, একটা জনপ্রাণী নেই আশেপাশে, তারই ভেতর নজর ক'রে ক'রে বুড়ো চলে— আর এক-একবার ডেকে ওঠে : "চড়ুই রে— ও চড়ুই—"

হাওয়া সরসর করে বাঁশপাতায়।

কতক্ষণ পর আবার ডেকে ওঠে : "চড়ুই রে— ও চড়ুই—"

একটা কাঠবেড়াল দেখছিল ডালের ফাঁকে মুখ বের করে, ঢুকে গেল।

বেলা পড়ে এল। বুড়ো যে ঘোরে ঘোরে কদ্দূর চলে এসেছে সে আর খেয়াল নেই। হঠাৎ চার ধার ছায়া-ছায়া লাগতে এক জায়গায় এসে নজর করে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। জ্বালানি কাটতেও তো কত বন ঢুঁড়েছে, এখানে তো আসে নি কখনও! সন্ধ্যে হয়ে গেল। এখন ফেরে কোন্ পথে? না ফিরলে থাকে কোথায়? দেখতে দেখতে ছায়া কালো হয়ে উঠেছে। ভারি দমে গেল বুড়োর মনটা।

বুড়ো তখন একদিকে কতক পথ যায়, ফের ফিরে আসে। আবার আরেকদিকে কতক পথ যায়, ফিরে আসে। রাত যখন জমে উঠেছে, আরো দূর বনের ভেতর হঠাৎ দেখে, তাই তো! আলো জ্বলছে না? আলোই তো! তা হলে আলো যখন, নিশ্চয় বসত আছে। ভেবে সে আর কিছু না ভেবে এগিয়ে গেল আলো লক্ষ্য করে। আরো খানিকটা গিয়ে দেখে আলো তো নয়, আলোর দেয়ালি। হাজারে হাজারে সবজে-নীল আলোয় যেন ঝলমল হয়ে আছে বনের খানিকটা। আরো যেতে দেখে আলো তো নয়, ঝাঁক বেঁধে বেঁধে জোনাকি জ্বলজ্বল করছে কঞ্চিবাঁশ ফেঁড়ে-বেঁকিয়ে অপরূপ নকশা করে গড়া একখানা ফটকের গা লেপটে। সে সামনে যেতে আপনাতেই ফটক খুলে গেল।

ঢুকবে কি?

ভাবতেই ও মা! দেখে, ঝাঁক বেঁধে গুচ্ছের চড়ুই— তাদের বাহার বা কী, দেখেই মনে হয় খুব সেজেছে সব মণিমুক্তোর চমক দিয়ে দিয়ে! তারা

বুড়োর চার ধার ঘিরে নেচে-কুঁদে তাকে যেন আঁকড়ে ঠেলে নিয়ে চলল ভেতরবাগে।

ফটক পার হতেই চার ধারে লাল-নীল ফোঁটার ঝাড় আলো রোশনি দিয়ে উঠছে ফুলপাতার ভেতরে ভেতরে— পার হয়ে, এক এক মহল ঢুকে বেরিয়ে, তারা হাজির হল মস্ত এক মাঝ-কোঠায়। সেখানে, দেখেই বোঝা যায় রাজারানী দুই চড়ুই পাখি, অতখানি উঁচু পালঙ্কের গদির ওপরে বসে, আর তাদের পায়ের গোড়ায়— ওই যে! তার সেই ছোট্ট ঠোঁটকাটা আদরের চড়ুই— তখুনি ওড়া দিয়ে সে বসল এসে বুড়োর কাঁধে। এত গোলমাল আশ্চর্যের মধ্যেও বুড়োর স্বস্তি লাগল যেন। সে বলে, "চড়ুই, চলে এলি কেন আমাদের ছেড়ে?"

চড়ুই-রাজা তখন মানুষভাষায় বলছে, "তোমরা আমার মেয়েটার জীবন রক্ষা করেছ, বাপমায়ের মতন আদর করেছ, তোমাদের উপকার তো কখ্খনো ভুলব না।"

বুড়ো তখন বলছে, "কী রে চড়ুই বল্, তুই কি যাবি না ফিরে? থেকে যাবি এখানে তুই?"

আর বুড়োর কথা শেষ না হতেই চোখের জল ফেলতে লেগেছে রাজারানী দুজনাতে।

মেয়ে বলছে, "যাব বাবা, যখনই হোক ফের যাব। এখন থাকো তো তুমি কটা দিন আমাদের বাড়ি!"

বুড়ো দেখলে বাবামায়ের কোল থেকে মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হয় না। সে বললে, "না রে মা। তুই ভালো আছিস, বাবামায়ের কোলে ফিরেছিস— জেনে নিশ্চিন্তি হলুম।"

"আমি এখুনি চলে যাব। না যাওয়া অবধি জানিস তো, কী রকম ভাববে তোর মা। কিন্তু— ফেরাপথটা খুঁজে পাব তো?"

"সে তোমার ভাবনা নেই গো বাবা। আমার সাথীরা তোমায় নিয়ে

যাবে পথ দেখিয়ে।"

রাত পুইয়ে গেল। ভোরে, ফেরার কালে রাজা একটা ছোটো একটা বড়ো দুটো ফুলকাটা ফটিকের বাক্‌শো এনে ধরেছে : "আমাদের স্মৃতি ব'লে একটা বাক্‌শো ঘরে নিয়ে যাও বাবা।"

"স্মৃতি তো মনেই থাকবে গো। সে কী বাক্‌শোতে লেখা থাকে?"

"তা হোক, না নিলে হবে না, তুমি নাও।"

বুড়ো অনিচ্ছেয় নিলে ছোটো বাক্‌শোটা।

সক্কালবেলার বনপথ ধরে একগুচ্ছের চড়ুই তাকে পথ দেখিয়ে চেনা পথে তুলে দিয়ে গেল। ফিরতে দেখে বুড়ি বসে আছে দোরগোড়ায়।

"কী গো, পেলে না?"

"পেলুম।" ব'লে বুড়ো একনিশ্বাসে বললে কালকে রাতের আশ্চর্য গল্প। তারপর বুড়োবুড়ি একত্তরে বসে খুলল বাক্‌শোখানা। সে যে কত মণি কত মুক্তো সোনাদানা রাজার ঐশ্বর্য! পুরো জায়গাটা আলো হয়ে গেল যেন।

কী করবে তারা এত সব নিয়ে? তার এক-আধখানা নিয়ে বেচে আসতেই বুড়ো বড়োলোক হয়ে গেল রাতারাতি। মস্ত বাড়ি উঠল তার। বাড়িতে করতে-কম্মাতে এল অমন অত অত দাসদাসী।

এদিকে, পাশের বাড়ির সেই যে পড়শি-গিন্নি, শুনে অবধি সে পুড়তে শুরু হয়েছে মনে মনে। রোজ এসে বলে, বলো না পথটুকু? একবার যাই, দেখে আসি। রাগের মাথায় হাতাখানা ছুঁড়েছিলুম, সে কি মারবঁ মনে করে? আহা! রাগ, না পাপ। সেই অবধি মনটা আমার এমনি খারাপ হয়ে আছে!

অগত্যা একদিন বুড়ো বললে কোন্ পথে কিভাবে সে পৌঁছেছিল গিয়ে চড়ুই-রাজপুরী।

শুনে পরে সে পড়শি-গিন্নিও গিয়েছিল সে পথে। বাক্‌শোও সে পেয়েছিল, রাজার দান। কিন্তু সে গেছে যত পায়, পেতে। কাজেই বড়ো

বাক্শোটা নিয়েই সে ফিরছিল। পথেই ভারি লোভ হল, একবার দেখে— ছোটো বাক্শোয় যখন এত, বড়োটাতে না জানি কী। কৌতূহলে ফুটতে ফুটতে মাঝপথেই খুলতে বসল সে বাক্শো। আর খুলতেই—

চুল ছেঁড়া, মুখ ফাটা, কাপড় ফালাফালা— পড়শি-গিন্নি কাঁদতে কাঁদতে এসে বলছে আমাদের বুড়িকে : "আমারই দোষ গো দিদি! লোভ বড়ো পাপ—"

খুলতে, অমনি সে বাক্শো থেকে দমকা ধোঁয়া দিয়ে বেরোলো— না গো, সোনাদানা নয় গো দিদি! সে যে সব কী ভয়ঙ্কর জীব— সে ভূত, না প্রেত, না পিশেচ, না শাঁকিনী-ডাকিনী— তারা যে কী, জানি না! তখন কেবল প্রাণভয়ে ছুটছি— এই বুঝি ধরে— জিভ বেরিয়ে আসছে তাও ছুটছি—

না, কেউ ছোঁয়ও নি, ধরেও নি! কেবল ছুটতে গিয়ে ঝাড়ে-কাঁটায় চুল ছিঁড়েছে, গা-হাত কেটেছে, কাপড় ফালাফালা—

পড়শি-গিন্নি খালি অঝোরে কাঁদছে তখন বুড়ির পায়ের গোড়ায় বসে।



দুই ব্যাঙের গল্প

ওসাকা শহরের সাগরপাড়ে থাকত এক ব্যাঙ। কিয়োতো শহরের ধারবাওয়া নদীপাড়েও থাকত এক ব্যাঙ। এত দূর পথ যে কেউ কাউকে চেনা দূর, নামটাও জানত না।

হলে কী, আজব ব্যাপার দেখ, দুজনার ঠিক একদিনেই মনে এল কথাখানা: এদ্দিন গেল, এত বড়ো দেশ, তার কই কিছুই তো প্রায় দেখা হল না! কিয়োতোর ব্যাঙ ভাবলে, কত্ত সুন্দর জায়গা শুনেছি ওসাকা, আগে ছিল বিশাল জাহাজঘাটা। ওসাকার ব্যাঙ ভাবলে, কত্ত পুরোনো দেশ শুনেছি কিয়োতো— মিকোতোর রাজবাড়ি, কিঙ্কাকুজির কনকমন্দিরের পাইন গাছ, বিওয়া সরোবর, কত্ত কী!

নাঃ, এবারে একবার না বেরোলেই নয়। ভেবে, আজব ব্যাপার দেখ, জ্ঞাতপড়শিদের ডেকে চোখের জল ফেলে বিদায় নিয়ে, দুজনেই ঠিক এক দিনে এক ক্ষণে বেরিয়ে পড়ল ঝোলাঝুলি বেঁধে।

ওসাকার ব্যাঙ চলেছে ওসাকার পাহাড়মুখো। যাকে পায়, বলে, চললুম গো।

কিয়োতোর ব্যাঙ চলেছে কিয়োতোর পাহাড়ধারে। যাকে পায়, বলে,

এই যে দাদা, একটু ঘুরে আসি। চলি-উঠি, গুটি-গুটি, চলেছে। ভিজে, শিশির, পাথর, গড়ান, ঝিঁঝির কুঁড়ি, মেঘের ফুল— করতে করতে এসে গেল খোলামকুচি পিঠেমুচি আওতাগুচি— সেখান থেকে মিয়াকো হোটেল ঘুরে সতর খাবারের সুগন্ধ শুঁকতে শুঁকতে শুরু হল পাহাড়-বাওয়া।

ওদিকের ব্যাঙ চলেছে লাফে লাফে। জাল বাওয়া, নানিওয়া, ফেনাকাঠ, খোলা কানা, চি দোরি, শুঁয়ো কাঁটা, ছিনে জোঁক— করতে করতে— শুকো পাতা, উমে ফুল, সাত ঘাস, নোয়া বাঁশ— ঠেলে ঠেলে একেবারে দেখা-হওয়া পাহাড়ের গোড়ায়, সেখান থেকে শুরু হল পাহাড়-বাওয়া।

আসলে একটাই পাহাড়, দু ব্যাঙ উঠছে দু ধার দিয়ে। উঠছে এবার বড়ো বড়ো ডিঙি দিয়ে দিয়ে— ওধারে গেলে তবে না যাওয়া! লোকের কথা, সাধুর পাঠ, দেউলের ঘন্টা— সব মিলিয়ে এল। রাত্তির জমে উঠেছে। আর অবাক ব্যাপারখানা দেখ, দুজন ঠিক এক দণ্ডে এক ক্ষণে এক সাথে চড়েছে গিয়ে পাহাড়চুড়োর কষকষে পাষাণপাটাখানায়। উঠে দাঁড়িয়েই দুজন দুজনকে দেখে চেঁচিয়ে উঠেছে, "আরে দাদা যে! চললে কোথায়?"

না, পুরোনো রাজপুরী দেখতে কিয়োতোয়। তা এখানে একটু জিরোই বসে। জিরোতে বসে বলে, "কেমন বুঝছ দাদা!"

"না, বড্ড পা দাপাচ্ছে রে ভাই।"

"আমারও।"

"উঃ! মাজা কনকন, মাথা ঘুরঘুর।"

"আমারও রে ভাই। বড্ড পথ। তাই না?"

"হ্যাঁ রে দাদা, এত পথ বুঝি নি।"

"যাক গে যাক! রাতটুকু জিরুই প'ড়ে।"

রাত কাটলে দুজন উঠে বলে, "দেখ দাদা, উঠিছি পৃথিবীর চুড়োয়, এখান থেকেই একবার নজর করে দেখি আগে— ফের বার হাঁটা দেয়ার আগে।"

ব'লে দুজন দুজনকে বুকে জড়িয়ে উঠল দাঁড়িয়ে, যতখানি দাঁড়িয়ে ওঠা যায়। তারপর—

তারপর যে যার সুমুখে নজর করে দেখে, ও মা! এ যে সেই এক সব ঘর বাড়ি জলা বাঁশ ঘাস ঝাড় পোকা— কিয়োতোর ব্যাঙ বলে, "ওই তো রে সেই একধারা মিকোতোর রাজপুরীখানা, সেই শাকামুনির পুজোবাড়ি, সেই শোয়া পথ, সেই সব উড়ুক্কু গাছপালা—"

ওসাকার ব্যাঙ বলে, "ওই তো গো বেলে পাখিদের ঝাঁক আর সাদা আঁজি দেয়া পেল্লায় জলখানা রে ভাই, এক্কেবারে এক বস্তু বসানো—"

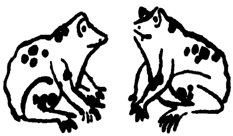
অনেকক্ষণ নজর ক'রে দেখে দুজনারই নিশ্ছিদ্রি প্রেত্যয় হল যে দুটো জায়গাই অবিকল একরকম, একটাতেও আরেকধারা বলতে কিছু নেই।

এমন কি ব্যাঙেদের পোকা-ভুর্‌ভুর্ একছেঁয়ে পানাডোবার ঘরগুনো পর্যন্ত এক্কেবারে একরকম।

আরে ছ্যা, ছ্যা! আগে জানলে কে কষ্ট করত গো এতখানি!

না রে ভাই, আর যাওয়া নয়। ফেরা যাক এবার মানে মানে। গিয়ে বলব সব্বাইকে ভেঙে কথাখানা।

চুপি চুপি বলে দি তা হলে। জানো তো, ব্যাঙেদের চোখ চলে পিছুমুখো?



চললুম কুবানা শহর

"চললুম কুবানায়—" বেড়াল বলছিল মুখ টিপে,
কুবানার রাস্তাতে আমার লম্প গেল নিবে।
যতই জ্বালি আগুনকাঠি, আর সে জ্বলে তাতে?
নাচার হয়ে বসে পড়লুম চায়ের দোকানটাতে।

ডাকছি : হ্যাঁ গা কত্তা, টুকু জল খাওয়াবে? "না সে
কঠিনটা কী! জল দেব না, জল চেয়ে যে আসে?
কিন্তু বিপদ, গেলাস-ঘটির একটারও নেই তলা. . .
উঃ! কী রকম জিরেন মিঠেন গলা!

বেশ! তবে চা-ই বানাও না-হয়, খাই দু চুমুক রয়ে,
বলছে সে, "চা করতে কী আর হাতটা যাবে ক্ষয়ে?
কিন্তু বিপদ, এই দেখ, নেই কেটলিটারই তলা. . ."
উঃ! কী রকম জিরেন মিঠেন গলা!

যাক-গে! তোমার নলচেটা দাও, টান দি যটা পারি।
বলছে, "সে আর এমনটা কী! কিন্তু কী ঝকমারি,
জানিই নে এই হুঁকোর কখন খসল গোটা তলা. . ."
উঃ! কী রকম জিরেন মিঠেন গলা!

একটা দুটো তিনটে ছ-টা, সাত কাটো তার থেকে।
"চললুম কুবানা শহর—" বলছে বেড়াল ডেকে।

নক্‌শাই কিমোনোর গল্প

হদ্দ বোকাদের এক গাঁ। সে গাঁয়ের লোকেদের ছিরিই বা কী! কেউ বাঁশপাতার মতো বাঁয়ে হেলছে বাতাসে দুলছে, কেউ কুমড়োপটাশের মতো নাদাই নকুড়, কারও মাথাটা সুগোল পাঁচনম্বুরি, কারও মুখখানা কুতকুতে পেঁচার মতন অবিকল— যাক-গে যাক! লোকের বর্ণিমে দিয়ে আর কী হবে।

এদের মধ্যে ভারি বুদ্ধি একটা লোক— বুঝতেই পারছ সে বুদ্ধি হল দুষ্টুবুদ্ধি, সবটাই পেটে-পেটে, তাকে ওরা ডাকে ওতোকো ব'লে— "ওতোকো সান, ওতোকো সান, কোথায় যান— রয়ে যান", তো সে কথা কে বা কানে নেয়! ওতোকো তার সুন্দর কাঁচ্চিল গুলির মতো চোখদুটো চকচকিয়ে বলে: "যেথায় যাই, যাই, তোর কী রে হতচ্ছাড়া?" ব'লে, লোকটা সবসময় চারিচপাটে ঘুরছে। তবে কি না, বুঝতেই পারছ, সে বজ্জাতিরই ধান্ধায়।

একদিন রোদে ঘুরতে ঘুরতে বেলা পড়ে এল। তখনও ভারি ফুটফুটে বিকেলবেলাটা। গাঁ ছাড়িয়ে বনের পথে ওতোকো একটা তলতা বাঁশের আগা ভেঙে একখানা তোফা নল বানিয়ে ভাবছে, কী করা! নুড়িপাথর ভরে ভরে "বন্দুক-ফটাশ!" করে করে ছুঁড়বে? না কি বাঁশিই বানিয়ে

ফেলবে— একখানা সত্যিকেরে শাকুহাচি বাঁশের বাঁশি— গাল্ল ফুলিয়ে বাজাতে বাজাতে যাবে প্যাঁ পুঁ— প্যাঁ পুঁ—

নাঃ। কোনোই মানে হয় না। ভাবতে ভাবতে চোঙার একদিক দিয়ে একটা চোখ রেখে চাইতেই চোখে পড়ে ওদিকে— বাঃ! দিব্বি দেখায় তো! মনে হচ্ছে এইটুকু ফুকোর ভেতর দিয়ে ওদিককার গাছপালা পোকাপাখি আলোছায়া মেঘ-নীলের চেহারা যেন মজার খোলতাই হয়ে গেছে। এদিক সেদিক ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে, হঠাৎ পাতালতার আড়ালে দেখে একটা ছোট্ট তেঙ্গু।

তেঙ্গু কী বলো তো? তেঙ্গু হল একধারার পর্-ভূত। পর্ অর্থাৎ ছেলে-পরীর মতো ফুরফুরে দুটো ডানা তার, আর ভূতুমির নিশেনা হল একটুখানি বেঁড়ে চেহারার ওপরে টিকোলো লাল-টকটকে একটা নাক। তেঙ্গু হল মায়াধারী ভূত— ইচ্ছেরূপ নিতে পারে, আর একটু মানুষঘেঁষাও বটে। কারও তেমন অনিষ্টিতেও নেই।

তেঙ্গুকে দেখেই ওতোকোর একটা বজ্জাতি বুদ্ধি খুলে গেল। সে বড়ো একখানা নিশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে বাগিয়ে ধরলে চোঙাখানি। ততক্ষণে চাঁদ উঠে গেছে। চাঁদের দিকে চোঙা তাক করে ধরে আরো বড়ো নিশ্বাস ফেলে আর ব'লে ওঠে— "উঃ! কী বড়ো একখানা নদী বইছে চাঁদে! আর দেখ, দেখ, ঢেউয়ে লাফ মারছে কত্ত তারামাছ! উঃ বাব্বা! কী পাহাড়! আরে! আরে! খরগোশটা ওড়া-লাফ দিয়েছে গো—" ব'লেই, তিন পা সরে এসেছে— মাথায় না পড়ে!

তেঙ্গু আর কৌতূহল চাপতে পারলে না। "কী দেখছ গো ওতোকো দাদা?"

"আরে, দূর! দূর! এটা আবার কোত্থেকে বাগড়া দিতে এল? দূরবীন বাগিয়ে পরখ করে দেখছি একটু চাঁদটাকে, আর অমনি! কোথাকারের জঙুলি রে?"

"ওটা দূরবীন বুঝি! ও ওতোকো দাদা, আমায় দেখাও না গো একটাবার!"

"হ্যাঁ! তোকে দেখাতে গিয়ে ভাঙি আর কি! এত্ত কসরৎ করে বানালুম! তোকে দেখাব বলে? মাগনা?"

"মাগনা কেন দাদা। কী চাও, বলো না। একটাবার দেখব, কী নেবে বলো না।"

এখন, ওতোকোর ভারি পছন্দ হয়েছিল তেঙ্গুর গায়ের নকশাই কিমোনোখানা। চখরাবখরা জামার ভেতর ফুলের ফোঁড় তোলা তোফা জামা। সে বললে, "তোর ওই জামাটা যদি দিস তো তোকে দেখতে দিই। না হলে যা ভাগ!" বলে ওতোকো পিছু ফিরলে।

"জামা নেবে? তা নেও না। সে আর বেশি কী!" ব'লে, সে কিমোনোখানা খুলে দিল ওতোকোকে। "এবার তবে দাও, দেখি—"

ওতোকো জামাটা নিয়ে বললে, "পারবি দেখতে? মন চোখ একবগ্‌গা করে নিবিষ্টি হয়ে তবে দেখতে হয়। ফাজলামি নয়। পারবি? তা পারিস তো দেখ।"

ব'লে, চোঙাটা তেঙ্গুর হাতে দিয়ে ওতোকো হনহন করে ফিরে-পথে চলল গাঁ-মুখো। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গাঁয়ে ঢোকার মুখে একটা মেলা বসেছে যেন কিসের পরবের। কত যে পরব বারো মাসে, কী করে বলি বলো এখন কিসের পরব! মেলার চৌহদ্দিতে পা দেয়ার আগেই কিমোনোখানা গলিয়ে নিল ওতোকো। বেজায় সুন্দর, চেয়ে দেখার মতো জামাখানা। তারপর কী ভেবে ঢুকে পড়ল মেলায়।

আওয়াজে-আলোয় ঝলমলানো কাঁচকড়ির খেলা পুতুল বাজনা বাসন আরশির দোকান সব, আরশির সামনে আসতে হঠাৎ নজর পড়ল, আ রে! মুখ বাড়ায় আরশির ওপরে— ওতোকো সান কোথায়? কারও তো ছায়া পড়ে নি আরশিতে! মুখখানা আরো আগিয়ে নেয় আরশির কাছে—

কই? দেখা যাচ্ছে না তো কিছু আরশিতে!

তখন কী ভেবে পাশের লোকটিকে একটা ঠেলা দিতে লোকটা পেছন চেয়েই ছুটল পড়িমরি করে—

আরেক লোকের কাঁধদুটো ধরে ঝাঁকি দিতে সেও বিচ্ছিরি হাঁউমাউ করে দিল ছুট—

তা হলে কি—

ওতোকো ভাবলে, তা হলে কি সে পরেছে এদ্দিন যা শুধু কানেই শুনে এসেছে— সেই অদর্শা জামা?

সাহস বেড়ে গেল ওতোকোর। খাবার দোকানে গিয়ে ডেক থকে মোচি-মেঠাই তুলে সে গালে ফেলতে লাগল, অকাতরে— কেউ তাকে ধরেও না, মারেও না। লোকে দেখে খালি দোকানির ডেক থেকে আপনা থেকে মেঠাই উড়ে উড়ে কতক দূর না যেতে হারিয়ে যাচ্ছে— ও ব্বাবা! এ যে ভেলকি!

"লাগ ভেলকি লাগ ভেলকি লাগ ভেলকির খেলা হচ্ছে এদিকে— শোনো গো—" গোটা মেলাতে রটে যেতে বিলম্ব হল না।

লোক এল ভিড় করে। সোর গোল— তারই মধ্যে কে চেঁচায়, কে তার নাক মুলে দিয়ে গেল— কে? পাশে থেকে কে ককিয়ে উঠল, কে তার পেটে পেল্লায় চিমটি কেটেছে, কে কেঁদে উঠল, কে তার গালে ঘুষি মেরেছে বদা-ম্ করে— কে? কে?

কোথায় কে?

কোতোয়ালির একজন বড়োকর্তা পুলিশ এসেছিলেন ভিড় সামলাতে, তাঁর সামনা দিয়েই— একটা মেয়ে মেলা থেকে কিনেছে ফুলতোলা ফুরফুরে ছাতা একটা— যেন হাওয়া এসে ছিনিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলল সেটা মেলার ভিড় কাটিয়ে—

সে বেচারা কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল মাটির ওপর।



পুলিশকর্তা তখন তাঁর ডাণ্ডাখানা উঁচিয়ে ধাওয়া করেছেন ছাতার পিছু, হঠাৎ তাঁরই কানে বেপরোয়া টান— ও বাবা! পেছন দিকে, ফের পেছনে— ডাণ্ডা হাতেই তিনি ঘুরপাক খেয়ে গেলেন। এক ঘুর খেতে ফের, ফের টান— ফের ঘুর— সামলাতেই পারছেন না। আর যত্ত ভিড়, সর্বত্রজায়গা থেকে লোক এসে জুটেছে সেই নাকাল দেখতে— মুখ লাল হয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল তাঁর—

আর সেই মুহূর্তেই ওতোকো তাঁকে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে মেলা থেকে— এর দোকানের সামিগ্রি, ওর দোকানের খাবার তুলতে তুলতে— তারপর হনহনিয়ে লোকচোখের বাইরে গিয়ে টান দিয়ে খুলে ফেলেছে তেঙ্গুর জামা—

তখুনি যেমনকার তেমনি ওতোকো সান।

নাঃ একখানা মজা হল বটে। সবটা ফের মনে পড়তে এমনি হাসি পাচ্ছে যে সামলাতে পারে না। হাসতে হাসতে বসে পড়ল পথের ওপরে। হো হো করে হাসতে হাসতেই ছুটে লাফিয়ে পথ চ'লে শেষে ঢুকল গিয়ে ঘরে।

ঘরে মা দেখেন, নিষ্কম্মা হনুমান ছেলে তাঁর, হল কী তার আজকে? এত এত সামিগ্রি বা এনেছে কোত্থেকে? অত হাসি কিসের? কিছু খেয়েদেয়ে আসে নি তো?

মা কোথায়, কী করছে, ওতোকোর তো অত হুঁশ নেই। বেখেয়ালেই সে ফের গলিয়ে ফেলেছে তেঙ্গুর জামা। ব্যাস্, মা-র চোখের ওপরেই অমনি আর কেউ নেই— ঢলকে হাসির ঢেউ উঠছে খালি অন্ধকারে— ও মা গো! ভূতে পেলে নাকি ছেলেকে?

তখুনি জামা খুলে যেন বাতাসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ছেলে। নির্ঘাত ভূতে পেয়েছে! তিনি সামনে গিয়ে বলেন, "ওতোকো, ও জামা তুই কোত্থেকে পেলি?"

"জামা? পেলুম। পেয়ে গেলুম।"

"পেলি? পেয়ে গেলি? ও জামা পুড়িয়ে দিয়ায় এখুনি—"

"পুড়িয়ে দেব? আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দেব?" হাসির ধমকে ওতোকো গড়াগড়ি দিয়ে পড়ল। তারপর একটু সামলে বলে, "জামাতে চোখ দাও কেন মা, কত্ত খাবার এনেছি, খাও।"

"ওই ভূতের খাবার খাব?" মা চুপ করে গেলেন।

তারপর রাত্রে ছেলে ঘুমোলে পরে জামাটা বের করে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে তবে শান্তি। যাবে তো ভূত? যাবে এবার, মনে হয়। মনে হতে তখন গেলেন শুতে, নিশ্চিন্তি।

সক্কালবেলা ওতোকো উঠে খোঁজে তার জামা। তার সে জামা কই?

মাকে ডেকে তুলে বলে, "আমার জামা কোথায় গেল?"

"পুড়িয়ে দিয়েছি।"

"পুড়িয়ে দিয়েছ?"

"অলক্ষুণে জামা। বেশ করেছি পুড়িয়ে দিয়েছি।"

ওতোকোর চোখে জল এসে গেল। তার এত কষ্টের মজা। "কেন

পুড়িয়েছ?" তারপর সে বলে কী ভেবে, "কোথায় পুড়িয়েছ বলো?"

"উই বাগানে। দেখ্ সে ছাই হয়ে আছে গাছতলায়।"

ওতোকো গিয়ে দেখে সত্যি, তরতাজা ছাই এত কটা। কী হবে ছাই দিয়ে? দু হাতে ছাই ঘাঁটে আর ভাবে, কী হবে ছাই এই ছাই দিয়ে আর? হঠাৎ কী ভেবে ছাইকটাই সে গোটো করতে শুরু করে দিল মাটি কেঁকে। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ছোট্ট একটুখানি ঢিবি বানিয়ে হাতখানা তুলে হঠাৎ চমকে ওঠে— হাত তো নেই!

দেখেই, যেন ক্ষেপে গিয়ে পাগলের মতো সে গায়ে-পায়ে সর্বত্র ঘষতে-মাখতে লেগে গেল সেই ছাই। আর আশ্চর্য, তারই সামনে আস্তে আস্তে তার হাত পা পেট বুক মিলিয়ে সুন্‌সান্ হয়ে যেতে লাগল একে একে। মুখে-মাথায় সবজায়গায় ছাইয়ের লেপ পড়বার পর ওতোকো নিশ্চয় করে বুঝতে পারল, তাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

তখন ফের তার সাহস ফিরে এল, মজাও। পাড়ায় বেরিয়ে প্রথমেই ওতোকো এক ছেলের গাল দিল টিপে, সে থতমত। এক ছেলের মাথায় দিলে কষে গাঁট্টা। হাঁআঁআঁ করে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে সে ছুট দিয়ে উঠল ঘরে। এক বাজারির ঝাঁকাখানা দিল উলটে। সে কাউকে না দেখতে পেয়ে খালি কাঁপছে থরথর করে। একটা মেয়ের বাহার হাতপাখাখানা উড়িয়ে নিতে সে মেয়ে কেঁদে আছাড় খেয়ে পড়ল সেখানে। এমনি, সারা পাড়ায় ত্রাস ছড়িয়ে, নিজেও খানিক ক্লান্ত হয়ে, শেষে গিয়ে ঢুকল এক মেঠাইয়ের দোকানে। ঢুকে, যত দ্রব্য খাবার সেখানে ঘুরে ঘুরে তোলে আর খায়, একটার পর একটা। মেঠাইওলা লোকটা তো শিঁটিয়ে বসেছে ভয়ে। দেখে, মেঠাইগুনো ডেক থেকে উড়ে উড়ে উঠে হঠাৎ অদর্শন হয়ে যাচ্ছে মাঝপথে। হে বাবা বুৎসু ভগবান, বাঁচাও বাঁচাও— ভূত-পিশেচের হাতে পড়েছি নির্ঘাত! এ কী কাণ্ড! মেঠাইদোকানে আরো যে পাঁচটা লোক বসে খাচ্ছিল তাদেরও খাওয়া মাথায় উঠেছে ভয়ে।

এদিকে একনাগাড়ে অনেকগুনো মিষ্টি খাওয়ার ফেলে তেষ্টা লেগে গেছে ওতোকোর। সে তখন একটা ভাঁড় নিয়ে জল তুলে খাচ্ছে জালা থেকে—

কী কাণ্ড! জল খেতে গিয়ে ধুয়ে গেল ঠোঁটদুটো। ধুয়ে গেল মানে ঠোঁটদুটো অমনি ফুটে উঠেছে অদৃশ্য মুখের ওপরে। জলে চুমুক দিতে জল গড়িয়ে নাবছে চিবুকে গলায়, যেখানে যেখানে নাবছে ধুয়ে যাচ্ছে। যেখানে ধুয়ে যাচ্ছে, ফুটে উঠছে এমনি অদৃশ্য গায়ের ওপরে।

দোকানি লোকটা, দোকানের অন্য লোকরা, দেখছে তাজ্জব হয়ে। সেদিক চেয়ে ওতোকোরও হঠাও কেমন ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেল। হাতের খোরাটা সে চলকে ফেললে চমক খেয়ে। ভিজে গেল হাতটা। ভিজে গেল, মানে ভেসে উঠল হাত— ওতোকোরই চোখের ওপর। তাই তো! ভাবনার কথা। ভাবনা হল তো হাত দিয়ে মুছল একবার কপালটা, চোখদুটো— অদৃশ্য গায়ের ওপরে একটু একটু করে ভেসে উঠল ভাঙাচোরা একটা মুখ—

হ্যাঁ? এ যে ওতোকো! বেপট বজ্জাত বকাটে ছেলে ওতেকোর মুখ!

তাই? এত বড়ো বজ্জাতি? লাফ দিয়ে এসেছে লোকগুনো ধরতে। ওতোকো আর থাকে সেখানে? সেও রাস্তায় লাফ দিয়ে প'ড়ে ছুট— ছুট—

সেই সঙ্গে পেছনের লোকগুনো, সেই সঙ্গে আরো লোক, একপাল ছেলে, সবাই ছুটছে— ওতোকোও ছুটছে— আরো জোরে, হাওয়াবেগে— তার আদ্ধেক চেহারা ফুটে উঠেছে ততক্ষণে। চিৎকার— গালাগালি— ঢিলবাজি— স্রোতের মতো বয়ে আসছে পেছনে— জিভ বেরিয়ে গেল ওতোকোর ছুটতে ছুটতে—

শেষে যখন একেবারে ছুঁই-ছুঁই, আর উপায় নেই, সামনে পেয়ে গেল নদীটা— ভগবানের আশীর্বাদ আর কাকে বলে! ওতোকো ওপর থেকে

গড়ান দিয়ে হু হু করে নেবে গেল জলে, নেবেই ডুব—

ডুব দিয়েই রইল, যত সময় পারে। কতক্ষণ দম থাকে, বলো! মাথা জাগাতেই অমনি ধাঁ করে বেজে পড়ে ঢিল। ডুবসাঁতার সাঁতরে দূরে যেতে চলল ওতোকো। কতক্ষণ যোঝা যায় বলো স্রোতের সাথে! কতক্ষণ পার বা পাওয়া যায় এতগুনো লোকের হাত থেকে!

হিড়হিড় করে টেনে তুলল সব ওতোকোকে। কোনো জায়গাটাই আর তার লুকোনো নেই।

পালা করে মারখানা যা হল! তাতে মেঠাইওলা লোকটার কিলচড়গুনো বেশি পড়েছিল, না অন্য লোকেদের, না পাড়ার সেই ছেলের পালের, বলতে পারব না। তবে ওতোকো নাক-কান মুলে বলল, এ সব সে কখ্খনো করে নি, এ ভূতের কাণ্ড। তাকে ভূতে পেয়েছিল।

ভূতে যে পেয়েছে, সে তো মা-ই বুঝতে পেরেছিল সেই রাতে। যাও, জিগেস করো গিয়ে!

এখন ছেড়েছে ভূত?

ওতোকোর ভূত বোধহয় সেদিনেই ছেড়ে গিয়েছিল। লোকে বলে, এখন তার মতো শান্ত ভদ্র কর্মিষ্ঠি লোক নাকি গাঁয়ে আর একটাও নেই।

তবে ওতোকো ভুলেও কখনও আর সন্ধ্যেবেলা বনের পথে যায় না। কেন বলো তো? হঠাৎ যদি তার কিছু একটা করতে ইচ্ছে হয়ে পড়ে? হঠাৎ যদি ফের দেখা হয়ে যায় কোনো তেঙ্গুর সাথে? ফের তার নক্শাই কিমোনোখানা যদি মনে ধরে যায়! বাব্বা।

পরীর মতন মেয়েটা গো

পরীর মতন মেয়েটা গো, ইঁদুররাজার রাজকুমারী,
ঠিকমতো ঘর-বর না পেয়ে রাজার মনে চিন্তা ভারি।
তোমরা সভা-ভর্তি এমনি বিজ্ঞিযুগ্যি মূষিক থাকতে
মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভেবে রাজার হবে দুপুর জাগতে?
তাই তো, এ যে ভীষণ ভাবনা, কারোর দেখছি খেয়ালই নেই।
আজই বসুন, যা হোক একটা ঠিক হয়ে যাক দিনে-দিনেই।
রাজার রাজা নেজুম রাজা, তাঁর মেয়ে, সেও একটা মাত্র,
আসুন দিকি খবর করি কোন্ দিকে কে শ্রেষ্ঠ পাত্র!
শ্রেষ্ঠ যদি চান মহারাজ, অভয় দেন তো কবুল করি,
ওই তো সোনার টুকরো ছেলে অরুণকুমার, সম্বছরই
আসছে-যাচ্ছে— ওর কথাটা একটু ভেবে দেখলে হয় না!
কে, ওই সুজ্জি? ইয়ার ছোকরা! ওকে দিচ্ছেন রাজার কন্যা?
ওই তো ট্যাবা লেবুর ছিরি, খড়ির আঁচা সমস্ত গায়—
দেখেন তো ওর কচকচিতে দুপুর-দিনটা জিরোনো দায়!
না না, যদি তা-ই ভাবেন তো ওই রয়েছেন গগন হুমকি।

একটু নয় তো বয়েস ভারী, রাজারাজড়ার সে এমুন কী!
যেমনি নীলা শিলার বর্ণ, তেমনি লম্বা, তেমনি চওড়া,
ওঁর চেয়ে সুপাত্র ভাবেন মিস্ত্রি দিয়েও যাবে গড়া!
গগনফগন রাখুন দিকি! এঁরাও তো মূষকুলীন রাজা—
ঠাকুরবংশী— তার পাশে ওই গগনটা তো হাঁড়িচাঁচা!
আর তা ছাড়া হুমকি বলুন, জুমকি বলুন, কম দেখিছি?
আসুক দিকি দাবড়ে ঘোড়া মেঘরাজা! সব অমনি চিঁচিঁ!
রাজা তো মেঘরাজা! কী দাপ! জোনাক-তোলা টোপর প'রে
বাজ-তরোয়াল ঝলকে যখন চলতে থাকেন, মুণ্ডু ঘোরে।
পালটি ঘরটি চান তো যান না, মেঘরাজাকে আনুন ডেকে।
সত্যি কথা বলব, তা কি বলতে হবে রেখে-ঢেকে?
রাজারাজড়াই চাই কে বলল! দেব্‌তাতেই বা দোষটা কিসে!
ওই তো দেব্‌তা পবন দেব্‌তা— একটু ছেলেমান্‌ষী দিশে
আছে সে ঠিক, নইলে কেউ কি ফুঁ দেয় খালি আনা-যানা?
পড়ি-মরি মেঘারাজার দেখুন তাইতে দৌড়খানা!
ঠাকুরদেব্‌তা মাথায় থাকুন। কিন্তু দাদা, এও বলি শেষ,
অমনিধারা খামখেয়ালির সামাল দেওয়াও শাস্তিবিশেষ।
আর তা ছাড়া মেয়েটাকে দেশছাড়াই বা কেন করা,
ক্যান্‌ রে বাপু, হদ্দ দেশে পাত্র কি নেই হাতে ধরা?
খুব তো দেব্‌তা পবনদেব্‌তা শুনতে পাচ্ছি হাঁকেডাকে,
হটাক দিকি আমাদের ওই ফুরু নদীর পাড়খানাকে!
ছোকরা যেন লোহার শরীর, দেখতে তো পান দিনে-রাতে
গোটা নদীর বান-তুফানটা আগলে শুধু দুটো হাতে!
এই নেজুমি স্বর্ণভূমি, শত্রু তেমনি শত শত,
এমন একটা ভরসা থাকলে ভাবুন তো নিশ্চিন্দি কত!

ছ্যা ছ্যা, ও কী কথা হল— সভাজনের কানে তোলা
ও কী কথা! রাজকুমারীর বর হবে ওই পাহারোলা।
আরে মশায়, শক্তি-শক্তি করে যাচ্ছেন নেচে নেচে—
এখানেও যে মহা মহা ইঁদুরকুমার বীর রয়েছে!
এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে ফিরছে মাইল মাইল শুলুকসন্ধি,
পাতালদেশের আস্তটা যে করে তুলল ইঁদুরবন্দী!
মহা মহা বীর সমস্ত জাপানদিশি ইশুন বোশি—
পাত্র যদি বাছতে হয় তো ঠাণ্ডা হয়ে আসুন বসি।
এই ইঁদুরটি দিব্য মূর্তি, এই মূষোটি রূপের ভুষো,
ওদের ঘরের ছোটনকুমার বেড়াল খেলায় একলা দুশো,
পাঁশবাজারের কষ্টিইঁদুর অষ্টধাতুর মিষ্টি পাকায়,
মোহরকুঠির নবাবজাদা বারো মোষের গাড়ি হাঁকায়,
ওকে দেখুন খড়্গশক্তি, ওকে দেখুন ব্যাঘ্রতেজা,
ওই ইঁদুরের লেজ দেখেছেন? নরম যেন পশম পেঁজা।
ওটির শুধু এক-একবারের দাঁত-মাজাতেই বারো আনা—
আরো কি চান বাছতে? তো যান, ধানবনে হোন কুকুর-কাণা. . .
যা হোক, শুভ দিনেখ্যানে বাজনাবাতির ধুন্ধুমারী
মাথায় করে পিঁড়েয় উঠে বসল এসে রাজকুমারী,
পরীর মতন মেয়েটা, তার বর দেখে যা, বর দেখে যা—
ফুটফুটে বর, লেজ দেখেছিস? নরম যেন পশম পেঁজা. . .

জাপনি ভাষায় ইঁদুর হল নে, ভীষণ তার মান জাপানদেশে। সৌভাগ্য-ঠাকুর দাইকোকু ঠাকুরের চেলা এই নেজুমি-ইঁদুর। ইশুন বোশি জাপানি উপকথার দেড়-আঙুলে বীর ছেলে।

কান্ননের বর

কান্নন হলেন দয়াবতী করুণাদেবী। তাঁর এক মন্দির আছে হাসে-তে।

একবার একবার এক হতভাগা অপদার্থ লোক সব দিকে হার হয়ে হতাশ হয়ে শেষকালে হাসে-র কান্ননমন্দিরে গিয়ে হত্যা দিলে। সারাদিন সারারাত পুইয়ে ফের সারাদিন সারারাত পড়ে আছে, দেবীর কৃপা না হলে এখানেই জীবন অবসান করে দেবে মানস করে এসেছে— ডালা-পাঠ-পুজো-আচ্চার পরে খালি চোখের জল আর মনের তাপ . . . সময় যায়, দেহমনেরও সাড় যায়, আশা আর কষ্টও ছায়া হয়ে আসতে থাকে ক্রমে ক্রমে— শেষে চেতনা যায় তবু পড়ে আছে যেন ঘোরের ভেতর, ওঠে না! অবশেষে একদিন ভোর-ফোটো-ফোটো মুহূর্তে সে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল।

দেখল, যেন মন্দিরের মূল মণিঘর থেকে দেবী তাঁর বেদী ছেড়ে উঠে পার হয়ে এলেন একের পর এক মহল, শেষে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন: "দেখ্, গত জন্মে ভারি মন্দ ছিলি তুই, এ জীবনে তারই শাস্তি পাচ্ছিস। বৃথা পড়ে আছিস হত্যে দিয়ে, এ জন্মে তোর যা ভাগ্য স্থির হয়ে আছে তাতে একটা ছোট্ট দয়াও তোর পাবার নয়। তোর ওপরে মায়া হচ্ছে রে।"

ব'লে, দেবী একটু থেমে ফের বললেন, "দুঃখু হচ্ছে রে তোর জন্যে।

তাই একটা ছোট্ট কুটোনাটা যা হোক তোকে দেব। ফিরে যা। যাবার পথে যদি কিছু পাস, যত ছোটোই হোক ফেলে দিস না।"

কথাটুকুর সঙ্গে-সঙ্গেই চটকা দিয়ে ঘুম ভেঙে গেল। জেগে, উঠে ব'সে, লোকটা ভাবে সত্যিই কান্নন তাকে দেখা দিয়েছিলেন।

তা হলে আর প'ড়ে থাকা কেন? ফেরার জন্যে তখুনি সে উঠে পড়ল। উঠে, মন্দির থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে, হঠাৎ দেখে আঙুলের ফাঁকে লম্বা একটা কুটো-খড় বেধে উঠেছে। দেখেই ছাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা।

খড়টা সে ফেলল না।

বসন্ত মাসের গর্মি করা দিন। ফুল ফুটে ফুটে ভোর হয়ে পড়েছে চারি ধারে। যেতে যেতে একটা ভোমরা হঠাৎ ভোঁ ওঁ ওঁ ওঁ করে ধরলে এসে পথে। কানে মুখে মাথায় গোঁৎ খেয়ে খেয়ে পড়ে— হাতে ঠেলে, বাড়ি দিয়ে, কিছুতে তাড়ানো যায় না। গাছের একটা ডগা-ডাল ভেঙে তাড়াল, তো তখুনি ফের উড়ে এসে মুখে পড়ে বিপুল বিক্রমে।

লোকটা কোনমতে থাবড়া দিয়ে ধরে ফেলল ভোমরাটা। তারপর সেই ডগা-ডালটার সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধল হাতের খড়টা দিয়ে। বেশ একখানা নিশেন হল যা হোক। এবার সেটা উঁচু করে চলল বয়ে নিয়ে। ভোমরা বাঁধা পড়ে ভোঁওঁওঁ ভোঁওঁওঁ করে আস্ফালন করতে করতে চলল পথখানা।

এখন হয়েছে কী, গোরুর গাড়ি চেপে দাসদাসী সঙ্গে করে কিয়োতো থেকে হাসে-র মন্দিরে পুজো দিতে আসছে তখন একটা দল। ঐকটা ছোটো ছেলে বসেছে তার মায়ের সঙ্গে ছইয়ের ভেতর, জাফরি দিয়ে বাইরে দেখতে দেখতে যাচ্ছে। তার হঠাৎ চোখে পড়ল লোকটার হাতে ধরা কেলে ভোমরা— ডগা-ডালে বাঁধা হয়ে ভোঁ ওঁ ওঁ ভোঁ ওঁ ওঁ করছে আর ছটকাচ্ছে এদিকে ওদিকে— ভারি তো মজার খেলনা! দেখেই "আমায় দাও, আমায় দাও—" করে সে কেঁদেকেটে বায়না জুড়ে দিল রাস্তার ওপরে—

ঘোড়ার পিঠে চলছিল পাইক কর্মচারী, সে ঘোড়া থেকে নেবে এসে লোকটাকে বলছে, "খোকাবাবু বায়না ধরেছেন তোমার ওই খেলাটার জন্যে, পারো তো দিয়ে দেও না বাপু!"

সে আর বেশি কী! কিন্তু খড়টা যে পেয়েছে কান্নন সামার কাছ থেকে? হোক গে হোক! একটা ছোটো ছেলে চাইছে, দেব না? ভেবে সে খড়ের বাঁধা সুদ্ধু ভোমরাটা আপনি গিয়ে ধরিয়ে দিল ছেলেটার হাতে। খেলা পেয়ে ছেলের কান্না থামল।

মা তাকে বলছেন, "আহা বাছা, মুখটা শুকনো, নিশ্চয় তেষ্টাতে। তো এই ফলটুকু ধরো বাছা, খাও।" বলে তার হাতে দিলেন তিনটে এতখানি টস্‌টসে কমলালেবু।

দলটা তাকে পেছনে ফেলে চলে গেল।

লোকটা তখন ভাবছে, কতটুকু বা এলুম; এরই মধ্যে একগাছা কুটো-খড় হয়ে গেল তিনটে এতখানিখানি কমলালেবু! সত্যি কি মা কান্ননের কৃপা? ভেবে, সে ফের হাঁটতে শুরু করে দিল।

কতক পথ গিয়ে দেখে পথের ধারে এক রূপুসী বউ চাকরদাসীদের মহা পাকে ফেলে পা ছড়িয়ে বসে পড়েছে রাস্তার ওপরে। মাথা নুয়ে বসে হাত নেড়ে বলে, একটু জল না পেলে আর এক-পাও সে চলতে পারবে না। "কেমন কী না, বলেছিলুম না, জল নাও বেশি করে? এখন দেখ, জল কোথায় পাও!"

জল কোথায় এখানে? চার ধারে দুপুর তমতম করছে শুকনো মাঠ-আগাছার রাজ্যে— জলের লেখা কোনোখানে নেই। তারা মিনতি করে বলে, "মা-ঠাকরুন, জল সামনে গেলে পাব।"

"তো তোমরা যাও, গিয়ে নিয়েসো, আমি আর এক-পাও যাব না।"

লোকটা শুনে কাছে গিয়ে বলে, "আমার কাছে কমলালেবু আছে তিনটে, তেষ্টা যাবে এতে?"

"যাবে না?" উঠে দাঁড়িয়েছে সেই বউ: "তেষ্টায় কাঠ হয়ে গেছে বুক, এক ফোঁটা জল না পেলে বাঁচব?" ব'লে সে প্রায় কেড়েই নিলে কমলা তিনটে।. চারটে-ছটা কোয়া মুখে ফেলে চুষে চিবিয়ে তখন তার মুখে হাসি ফুটছে: "বাঁচালে দাদা!"

ব'লে সে একটা একটা করে তিনটে গোটা কমলা প্রায় এক নিশ্বাসে বসে খেলে। তারপর বলল, "মহাপ্রাণী বাঁচল, বাব্বাঃ! কী বা দেব তোমায়, কী বা দিই! আচ্ছা, এই নাও—" ব'লে মোট গাঁটরি টেনে সরিয়ে তিনটে বাণ্ডিল রেশমকাপড় বের করে দিল সে লোকটাকে।

লোকটা পিছিয়ে গেল। "না, না, এত দামি জিনিস—"

"দামি তো কী! প্রাণ বাঁচালে না তুমি আমার? কী আমায় ভাবছ হে? না নাও তো ভীষণ দুঃখু পাব।"

কী করা! তিন বাণ্ডিল রেশমকাপড় বগলদাবা করে সে ফের হাঁটা ধরলে।

বিকেল পড়ে আসছে। ছায়া নেবে পড়ছে ঝাপটা দিয়ে দিয়ে। হঠাৎ দেখে উলটো দিকে থেকে দড়বড়ি ঘোড়ায় চেপে আসছেন এক সামুরাই, পেছনে দলবল। কালচে-খয়েরি চিকচিক করছে অতখানি ঘোড়াটা, ঘাড় ভর্তি কেশর জ্বলজ্বল করছে— কী ঘোড়া! আপনিই তারিফ এসে পড়ে জিভের ডগায়।

ভাবতে ভাবতেই, কোত্থাও কিচ্ছু না— ঘোড়াটা টক্কর খেয়ে পড়ল রাস্তায় ওপরে— প্রায় তার সামনা দিয়েই—

সামনে লাফ দিয়ে নেবে দাঁড়িয়ে পড়লেন সামুরাই। ভারি বিপদ তো! কোত্থাও কিছু না, কী না ঘোড়াটা মরে পড়ল মাঝপথে! এখন এটাকে নিয়ে বা কী করি। সঙ্গের লোকজনকে ডেকে বললেন, "একটা ব্যবস্থা করো যা হোক। এভাবে রাস্তায় ফেলে যাওয়া যায় না এদ্দিনের সঙ্গী ঘোড়াটাকে।"



সামুরাই সেই মুহূর্তেই আরেকটা ঘোড়ায় উঠে এগিয়ে গেলেন। পেছনের লোকরা ঘোড়ার চার পাশে ঘিরে তখন জল্পনা করছে কিভাবে কী করা যায়।

লোকটা তখন সামনে গিয়ে বললে, "আমায় দিয়ে যাও তো তোমাদের ও ঘোড়া সৎকারের ব্যবস্থা আমি করতে পারি।"

এ ওর মুখ চাইছে সব লোকটার কথায়। সে তখন ফের বলে, "অমনি দিতে হবে না! এই নাও—"

ব'লে সে তিন বাণ্ডিলের একটা বাণ্ডিল রেশমকাপড় দিলে তাদের হাতে ধরে।

লোকগুনো তো অবাক। ঘোড়ার ব্যবস্থা শুধু নয়, উপরি আবার এতখানি একটা বাণ্ডিল রেশমকাপড়? কালবিলম্ব না করে তখুনি তারা হাঁটা দিলে হনহনিয়ে।

লোকটা তখন ভাবছে, কী কাণ্ড! একটা বেলার মধ্যে একগাছা কুটো-খড় হয়ে গেল কিনা দু বাণ্ডিল রেশমকাপড়ের ওপর এত বড়ো ঘোড়াটা! "মা গো মা কান্নন, যদি তুমি সত্যি হও, যদি তোমার কৃপা সত্যি হয়, তা হলে ঘোড়াটা জীইয়ে দাও মা!"

বলেছে, কেবল বলেছে মাত্র— ও মা! দেখতে দেখতে ঘোড়া যে

চোখ খুলে গায়ে-পায়ে নড়াচড়া দিয়ে উঠল। মাথা ঘুরিয়ে এদিকে ওদিকে চায়। তখন রাশ ধরে সে লোক চার পায়ে দাঁড় করিয়ে তুলল পশুটাকে। চার পায়ে দাঁড়াতেই অমনি ঘোড়া খুর দাপিয়ে দড়বড় করে উঠল।

চলতেই শুরু করে দিল তৎক্ষণাৎ। রাশ ধরে সে পেছন পেছন যায়— কিন্তু এ তো ঠিক কথা নয়! এমনি চললে তো লোক দেখলে ভাববে কার না কার ঘোড়া ভাগিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে সে— ঘোড়াচোর! বললেই হল, তাই না। রাশ টেনে বনের ভেতরবাগে ঢুকে গেল তখন সে ঘোড়াটাকে নিয়ে, তাকে বাঁধলে একটা গাছের সাথে, তারপর অন্ধকার ঘোর হলে পরে লোকালয়ে ঢুকে দু বাণ্ডিল কাপড় বদল দিয়ে কিনলে রাতের আহার আর ঘোড়ার পুরো নতুন সাজ এক প্রস্থ। তারপর খেয়েদেয়ে ঘোড়াকে পুরোনো সাজ ছাড়িয়ে নয়া সাজ পরিয়ে মাঝরাতে ঘোড়ায় চেপে বন ছেড়ে সে চলল সামনের শহরের দিকে।

পরদিন সক্কালবেলা পৌঁছল কিয়োতো।

শহরে ঢোকার প্রায় মুখটাতেই মস্ত হাতা ঘেরা বাড়ি, তার ফটকে বেজায় লোক জন সোর গোল, মনে হচ্ছে কেউ কোথাও দূরে যাবার জন্যে যেন তৈরি হচ্ছে বাড়িতে— দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল সেখানে।

এমনি কালেই না দরকার পড়ে একটা ঘোড়ার! কাকে পাড়ে তবে কথাটা? উস্‌খুস ক'রে এদিক চায় ওদিক চায়—

আর, তারই ভেতর বাড়ির মালিক বেরিয়ে এসেছেন একবার। অচেনা লোক দেখে ফটক পার হয়ে এলেন : "কে হে তুমি? কাকে চাও? ভারি সুন্দর তো তোমার ঘোড়াটা!"

"নেবেন ঘোড়াটা?"

নিলে তো ভালোই হত, কিন্তু নি কী করে! এক্কেবারে বেরোনোর মুখটা। গোছগাছ সারা। নগদ টাকাকড়ি সব বিলিব্যবস্থা হয়ে গেছে। নিলে এখন দাম দেব কী করে?

তখুনি একটু ভেবে ফের বলছেন নিজে মনে, আচ্ছা সামনে আমার ওই মাঠখানা তো রয়েছে! ফিরতেও তো ঢের দেরি!

তাকে বলছেন তখন শুনিয়ে, "আচ্ছা, ওই মাঠখানা লিখে দিলে দেওয়া যাবে না ঘোড়াটা?"

লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে এক ঝলক দেখে নিয়ে ভাবে, ও বাবা, অতখানি মাঠ! মুখে বলে, "কেন যাবে না!"

বলতেই তখুনি লেখাপড়া হয়ে গেল এক মাঠ জমি। মালিক বলছেন, "চাষ দিলে ফলন হবে প্রচুর। তুমি ঠকো নি।"

ঠকবার কথা কেন?

ঠকবার কোনোই কথা নেই আজকে। মা কান্নন আজ প্রসন্ন তার উপরে। আজ সে খালি পাবে। যা পাবার নয়, তা-ই পাবে। পুরো দিন যাবার আগেই তার একগাছা খড় হয়ে গেছে এতখানি এক মাঠ ক্ষেতের জমি।

যাবার মুখে মালিক তাকে ডেকে বলছেন, "শোনো হে! আমার বাড়িখানা তো পড়েই রইল। লোকজনও রইল দুচারজনা। তুমি চাও তো থাকো না এসে আমার বাড়িতে! যদ্দিন না ফিরি।"

লোকটা চুপ করে আছে দেখে ফের বলনে, "কী, থাকবে?"

হতভাগা অপদার্থ লোক। থাকব না মানে? কেন থাকব না!

ঘরের লোকজন তুলে নিয়ে সেদিনেই সে বাড়িতে সে এসে উঠল। থাকব, থাকবই তো!

থেকেই গেল সে তারপর। তার আর কোথাও যাওয়া হল না। কদিনের ভেতরেই হঠাৎ খবর এল— মালিক, তাঁর লোকজন, তাঁর সঙ্গের অত অত মোটঘাট জিনিসপাতি, সব বেপাত্তা হয়ে গেছে হঠাৎ কোথায় কোন্ এক দুর্ঘটনায়।

লোকটার মরার পর বংশানুক্রমে সেটাই এখন তাদের জমিদারি।

উরশিমার গল্প

জেলেদের ছেলে উরশিমা। উরশিমা তারো।

সমুদ্রের কোলে ছোট্ট জেলে গাঁ, মিজুনোয়ে। গাঁয়ের লোকের বচ্ছরের বেশির ভাগ কাটে জলে জলে। তাদের ঘরের ছেলে।

কত বা বয়স, সেই বয়সেই উরশিমা ডিঙি বাওয়ার মাছ ধরার ওস্তাদ, এমন কি বড়ো বড়ো হুনর মাঝি আর মেছোদের সঙ্গে তার পাল্লা। এক-একবার এমনও হয়েছে, সাগরদেবতা রাগ হয়েছেন, তারা জোয়ারের পর জোয়ার দরিয়ার ভেতরে ঢুকে গিয়েও একটা মাছের লেখা পায় নি। শুকনো মুখে ফিরে দেখে উরশিমা পেছনে আসছে, তার নৌকোর পাটাতনে লাফিয়ে উঠছে ঝাঁকা ভরা ভরা কাৎসুয়ো মাছ, তাই মাছ।

কোথায় মাছ পেলি উরশিমা? আমরা তো জল তোলপাড় করে দেখা পেলাম না একটার।

পেলুম।

কী করে পেলি?

সে কেমন করে বলব। ব'লে, মাছগুনো ঝাঁকা ভরে ভরে নাবিয়ে হাসতে হাসতে ছুট। পাড়ার ছেলেরা ঘিরে এসেছে উরশিমাদাদাকে তো

সে কারও পিঠে কারও মাথায় হাত রেখে হাসছে, কথা বলছে, ফিরে গিয়ে ঠোলা মালা ঝুলি ভরে ভরে দিল মাছ আর জলের নানান শাক শাঁখ খোলা—

দিন বেশ কাটছিল এমনি করে। কিন্তু একদিন কোত্থেকে যে কী হয়ে গেল হঠাৎ

সারাদিন সমুদ্রে কাটিয়ে উরশিমা ফিরেছে সন্ধ্যেবেলা। বালির ওপর ডিঙি তুলে মাছ খালুইয়ে ঝুলিয়ে পা বাড়িয়েছে বাড়িমুখো। হঠাৎ শোনে ওদিকটাতে বেজায় একটা সোরগোল। কী ব্যাপার ওখানে? এগিয়ে দেখে পাড়ার-বেপাড়ার এক পাল ছেলে— কী একটাকে ঘিরে সব খালি লাফাচ্ছে, খালি চেঁচাচ্ছে। উরশিমা পা চালিয়ে গিয়ে পড়ল তাদের মধ্যে— "কী হচ্ছে রে তোদের?"

ও মা, দেখে কি, একটা মস্ত বিরাট কচ্ছপ, আর সেই পাল ছেলে— কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে বেঁকারি, কঞ্চি-বাঁশ, কেউ পাথর-ঢেলা কাঁকর-নুড়ি হাতে, কারও শুধু মুঠো ভর্তি বালি— এবার আমি মারব, এবার আমার দান— বলে ঠেলাঠেলি হুল্লোড় লাগিয়ে দিয়েছে।

আর সেই সঙ্গে হাততালি গালাগালি ফাজলামি মুখভিংচি দুশো মজা। তারই ভেতর একটা ছেলে হাতের ছপ্‌টি ছপাং করে বসিয়ে দিয়েছে কচ্ছপের পিঠে— মেরেই হেসে গড়িয়ে ছটকে কুটোপাটি

অতখানি জানোয়ারটা যেন কুঁকড়ে এইটুকু হয়ে গেছে। ঝুঁকে পড়া মাথা সেঁদিয়ে নিয়েছে খোলার ভেতর। তাতে কী হবে! ঢিল এসে ধাঁ করে পড়ল পিঠে, বালির তাল ছুঁড়ে দিয়েছে কে মুখের ওপর—

উঃ! উরশিমা একটা জোয়ান ছেলে, তার যেন চোখ জ্বালা করতে লাগল যন্ত্রণাতে।

তখুনি আরেকটা ছেলে— এই এবার আমি, এবার আমি— বলে হাতের লাঠি ঘোরাতে শুরু করেছে বাঁইবাঁই করে—

উরশিমা মুহূর্তে কঠিন হয়ে পড়ল, লাঠিসুদ্ধ হাতখানা ধরে ফেলল

গিয়ে খপ্ করে : "থাম, এখুনি থাম বলছি—" চিৎকার করে উঠল সবার গলা ছাপিয়ে—

হঠাৎ বাধা পেয়ে ছেলের দল হকচকিয়ে গেছে, তাদের দৃষ্টি এক মুহূর্তে কচ্ছপের বদলে গিয়ে পড়েছে উরশিমার দিকে। গোঁয়ার এককাট্টা বলে উরশিমাকে সবাই খানিকটা সমীহ করে। কিন্তু মোড়লের ছেলেদুটো, জাহিয়ো আর উহিয়ো— "আমরা কচ্ছপটাকে ধরেছি উরশিমা, ওটা আমাদের—" বলে দাপিয়ে মুখিয়ে এল আগেভাগে।

উরশিমা চোখোচোখি চাইল একজনার দিকে! কিন্তু সে কি না ছেলেদেরও মোড়ল, কাজেই চোখ পাকিয়ে ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে এল উরশিমার দিকে, "বড্ড বেড়েছিস রে উরশিমা। ওটা আমাদের। আমাদের ভেতর তোকে এসে নাক গলাতে বলেছে কে রে?"

"ওটা তোদের?" কাঠ-কাঠ উরশিমার গলা।

"আমাদের না তো কি তোর? কষ্ট করে ধরেছি সমুদ্রের থেকে, একগলা জলে নেবে ধরেছি, জানিস? এখন উনি এলেন মোড়লি ফলাতে। আমাদের কচ্ছপ আমরা যা খুশি করব, তোর কী রে?" ব'লে সে আর দাঁড়াল না, দলে মিশে গিয়ে বলেছে, "নে, নে, ভারি ভয় সব! নে, শুরু কর— কার দান ছিল রে এবারে?"

"পারবি, এক বাড়িতে খোলাখানা ফাটাতে পারবি? কে পারবি, আয়? বাজি হয়ে যাক—"

উরশিমা দাঁড়াল গিয়ে কচ্ছপটাকে আগলে। "ছেড়ে দে ওকে।"

"ইশ্! কে রে আমার!" মুখ ভিংচে উঠল ছেলেটা। "কী রে, থেমে গেলি যে—" ফিরে বলছে সবার দিকে, "নে, কে মারবি বললি, আয়, এগিয়ে আয়! কই? নে, তা হলে সামলা আগে আমার এই এক ঘা, নে—"

উরশিমা তখন বলেছে, "ভালো চাস তো ছেড়ে দে বলছি ওকে।"

"ছাড়ব? আয় ছেড়ে দিচ্ছি!" বলে সে লাঠি তুলল উরশিমারই

দিকে— কিন্তু ফেলার আগেই উরশিমা তার মুখের ওপর হাঁকড়েছে প্রবল চড়। এক চড়ে তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ল ছেলেটা।

"এবারে কে মারবি? কার দান?" বলে উরশিমা আরেকটা বিপুল চড় লাগাল পাশের ছেলেটার গালে— "নে, কার বাজি এবার?" সেও ঘুরে পড়ল।

পরের ছেলেগুনো তখন পিছোচ্ছে এক পা এক পা। "বল্ এবার কার দান—" ব'লে যেদিকে পায় উরশিমা দমছুট ছুঁড়তে থাকে চড় ঘুষি এলোপাথাড়ি, লাল গনগন করছে তার মুখ— বাকি ছেলেরা এক পা দু পা হটতে হটতে শেষে দৌড়— দৌড়— নিমিষের মধ্যে যে যে-মুখো পারে।

যে ছেলেদুটো ঘুরে পড়েছিল— ছেলেদের পাণ্ডা, মোড়লের দুই ছেলে, তারাও ততক্ষণে সামলে উঠে কী ভেবে মুখ নিচু করে চলে গেল আস্তে আস্তে উরশিমার সঙ্গে তফাত রেখে। একটুর মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল সেখানে সমুদ্রপাড়টা।

উরশিমা তখন পায়ে পায়ে কচ্ছপটার পাশে এসে দাঁড়াল। ইশ্! দেখ কী হয়েছে! জমকালো চৌখুপি শক্ত পিঠটা— যেন ভেঙেচুরে ফালাপালা হয়ে গেছে নির্দয় ছেলেগুনোর অত্যাচারে। উরশিমা জল বয়ে নিয়েলো সমুদ্রের, কী সব ঘাসলতা ফেনাকাঠ জলে মেখে আস্তে আস্তে লেপ দিতে লাগল বসে কচ্ছপের পিঠে— আহা! কী হয়েছে পিঠখানা! এমনি মারে কেউ? যদি না এসে পড়তুম! যদি চোখে না পড়ত! কচ্ছপকে সে বলে, "কেন এসেছিলে এদ্দুর ড্যাঙাপাড়ে? এই সব নচ্ছার ছেলেদের পাড়াতে?"

কচ্ছপের চোখদুটো চকচক করছে, বোঝা যায়।

উরশিমা তখন দু হাতে কাঁধে তুলে বয়ে নিয়ে চলল তাকে জলে, ঢেউ বাঁচিয়ে ঢেউ কাটিয়ে চলে গেল সেই বুকজল গলাজল পার হয়ে— সেখানে টলটলে সাগরের ওপর আস্তে করে ভাসিয়ে দিলে তাকে— "যাও, ঘরে যাও। আর কখনও এসো না এদিকে।" বলে ফিরল উরশিমা।

মনে হয় কচ্ছপও জলচোখে ফিরে চেয়ে আছে।

উরশিমা ততক্ষণে বালি ভেঙে ভারী পায়ে ফিরছে জেলেপাড়ায়, ঘরমুখো, যেখানে মা-বাবা তার অপেক্ষায় এধার ওধার করছে খালি দোরের বাইরে।

এই শুরু।

মনটা তারপর কদিনই যেন ঝিমিয়ে আছে। দিন ফুটছে, দিন যাচ্ছে, কিচ্ছুতে যেন তার মন লাগে না। এক দিন দু দিন তিন দিন— বিশ্রী দিনগুনো। মা বলে, "হ্যাঁ রে বাবা, গুমরে রয়েছিস, দেহ খারাপ করেছে নাকি রে?"

বাবা বলে, "বেরোবি না আজকেও? না বেরোলে কি দেহে ফুর্তি হয়, না মন ভালো হয়! ঘরেও দেখ্ সব বাড়ন্ত হয়ে আছে।"

কটা দিন বাদ দিয়ে ফের বেরোতে শুরু করল উরশিমা।

আরো কদিন বাদে, সকালবেলাটা বিশ্রী গুমোট, বাতাস নেই, সমুদ্রের একটানা ঢেউয়ের আওয়াজ, ক্বচিৎ ওড়া-মাছের লাফ এক-একটা, সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে একসময় খালি দিকহারা নীল আর নীল, আর কিছু নেই, উরশিমার খেয়াল হল অনেকটা দূর চলে এসেছে বিমনা হয়ে জলের টানে টানে। তার মেছো ডিঙির নীচে জল পিছে জল সামনে পাশে যতদুর চোখ যায় জল আর জল। জাল বাওয়া দূরে গেল, উরশিমা ঝুঁকি দিয়ে দিয়ে জলের ওপর আঙুল টেনে টেনে আঁকিবুকি কাটতে লাগল অন্যমনে। হঠাৎ "উরশিমা সামা— উরশিমা সামা—" চমকে উঠল উরশিমা। খাঁ খাঁ মাঝদরিয়ার ভেতর মানুষের গলার আওয়াজ আসে কোথেকে? এদিক

ওদিক চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আবার আরটু বাদেই শোনে কে যেন কোথায় ডাকছে: "উরশিমা সামা— উরশিমা সামা—"

স্পষ্ট ডাকছে। কে ডাকছে? "কে?" বলে উরশিমা চেঁচিয়ে উঠে ফের আশে চায় পাশে চায়।

বিজন মরুভূমির মতো সাগর। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই, তার ভেতর কে যেন কোথায় আলগা ফিসফিসে গলায় বলছে, "আমি, উরশিমা সামা।"

কে আমি? আওয়াজ লক্ষ্য করে তাকাল উরশিমা, নজর করে দেখে জলের ভাঁজে যেন মিলিয়ে এগিয়ে আসছে একটা কচ্ছপ। কাছে আসতেই দেখতে পায়। ও মা, সেই কচ্ছপটা না? তাই তো! সেই তো মনে হয়! ও মা! সে নাকি কথা বলে মানুষের গলাতে।

ততক্ষণে কচ্ছপ এগিয়ে এসেছে ডিঙির পাশে, স্পষ্ট মানুষগলায় বলছে, "আমার জীবন বাঁচালে সেদিনে। আজ তোমার দেখতে পেয়ে এত আনন্দ হচ্ছে না— দেখেই অমনি এসেছি ছুট দিয়ে—"

উরশিমা অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে, "কিন্তু. . ."

কচ্ছপ বলে, "কিন্তু নয় উরশিমা সামা, সাগরপুরী জানো না তুমি? শোনো নি—"

"শুনব না কেন। কিন্তু. . ."

ভারি অস্বস্তি লাগছে উরশিমার, "তুমি জানো কী করে মানুষের ভাষা?"

"ও মা, সে জানব না? এখন বলো, সাগররাজকন্যার কথা শুনেছ কখনও?"

"সা গ র রা জ কু মা রী?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ। শোনো নি?"

"শুনব না কেন, কিন্তু সে তো গল্প— দিদার কাছে শুনেছি, পিসীর কাছে কত শুনেছি, কোথায় অতলবিতলের রাজ্যের নাকি পরমা রূপসী

এক রাজকন্যা"

"জানো তো তা হলে।"

"জানব না কেন। য়ামাতো দেশের কত বীর রাজপুত্র গেছে সেখানে রাজকন্যাকে রানী করে আনবে বলে, জানব না?"

"তারপর কী জানো?"

"কেউ খুঁজেই পায় নি দেশখানা।"

"তবে শোনো। তুমি সেদিনে যে প্রাণ বাঁচিয়েছ আমার—"

উরশিমার হঠাৎ ভারি সঙ্কোচ হল, "কী তখন থেকে খালি প্রাণ বাঁচিয়েছ প্রাণ বাঁচিয়েছ করছ— কতকগুনো বাঁদর ছেলের পাল্লায় পড়েছিলে। ওটা আবার একটা বলবার কথা? আর কখ্‌খনো গিয়ে পোড়ো না বাপু, দেখো—"

কচ্ছপ বলছে, "শোনো তবে, আমি হলুম সেই সাগররাজকন্যার সহচরী। ফিরে গিয়ে বললুম, তো সেদিন থেকেই রাজকন্যা বলছেন, তা হলে উরশিমা সামাকে আমন্ত্রন করে নিয়ায় না আমাদের দেশপুরীতে। থেকে যান আমাদের মান্যি অতিথি হয়ে কটা দিন—"

কচ্ছপ চাইল জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে।

উরশিমার ফের ভারি সঙ্কোচ হল। "ও মা, আমি যে মেছোদের ছেলে, আমি নাকি যেতে পারি রাজপুরীতে? আমি নাকি থাকব আবার রাজকন্যার অতিথি হয়ে? কী বলো কী?" উরশিমা হেসে উঠল হো হো করে। তার হাসির ঘা ঠিকরে উঠল নীল জলে বেজে, আর তাইতে যেন জলঘর ছেড়ে ওপরে বের হয়ে এসেছে রাশি রাশি কত্ত মাছ শাঁখ নাগ জলচর জীব— তারা উরশিমার ডিঙিখানার চার ধার বেয়ে স্পষ্ট মানুষগলায় বলছে, "স্বাগতম্ উরশিমা সামা, আসুন, আসুন না। থেকে যান না কটা দিন আমাদের দেশে, আসুন না—"

কী কাণ্ড! যাব? যাই তবে। আমায় বলেছে কি না সব যেতে। আমায়

বলছে কি না মান্য করে, উরশিমা সামা! কিন্তু যাব কিভাবে জলের পুরীতে? যাই তো ফের ফিরব কিভাবে?

"সে ভাববেন না।" কচ্ছপ বলে, "আমি নিয়ে যাব, ফের আমিই ফিরিয়ে দিয়াসব গিয়ে একেবারে আপনার ঘরের পাড়ে।"

তারপরেই বলে, "না না পাড়ে উঠব না তা বলে, পাড়ের নাগাল এলেই ফিরে যাব, দূর থেকেই ফিরে যাব।" নৌকোর পাশ ঘেঁষে এসে পিঠটা পেতে দিতে উরশিমা দেখে সে যেন বিশাল একখানা পুরু চেকনাই গদি— এত বড়ো? উরশিমা অকুতো হয়ে উঠে বসল।

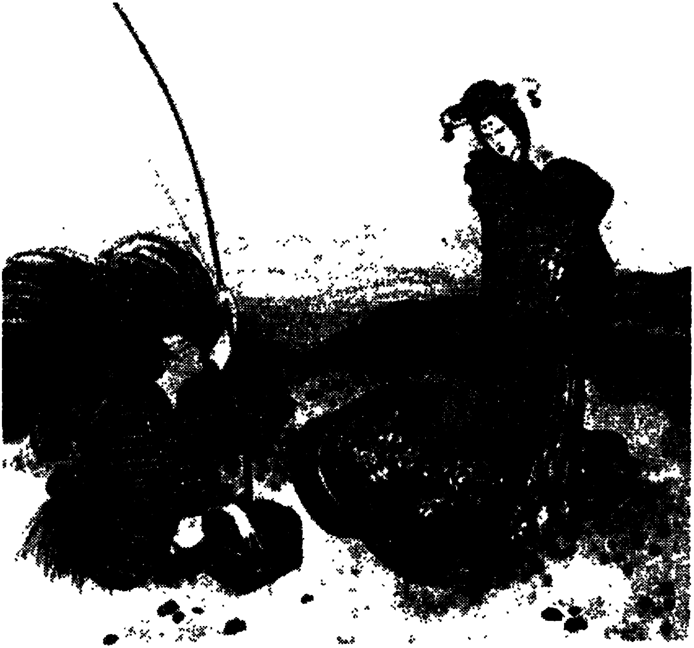
আর তখুনি তাকে পিঠে করে বিভঙ্গ-তরঙ্গহারা নিপাট নীলের ভেতরে হু হু করে সাঁতার দিয়ে চলল কচ্ছপ।

জল জল জল— জলের যেন শেষ নেই, উড়ে গেলেও যেন পার হওয়া যাবে না। সময় যাচ্ছে তো যাচ্ছে। চেয়ে চেয়ে ভরে উঠল উরশিমার চোখদুটো, তাও পথ ফুরোয় না।

"আর কদ্দূর?"

"এই তো!" বলতে বলতে শেওলা ঘাস ছাওয়া একখানা পাহাড় জেগে উঠেছে সমুদ্রের বুক ফুঁড়ে, তার কাছ বরাবর যেতেই কচ্ছপ ডুব দিল হঠাৎ জলের নীচে।

আশ্চর্য। উরশিমার একটু কষ্ট হল না, একটু দম ছুটল না। গভীর থেকে গভীরে কোণাকুনি সাঁতরে চলেছে লাল হলুদ তারপর স্বচ্ছ নীলের ভেতর দিয়ে— সে যেন জল নয় একটা আভা নীল আলো আর তার ভেতর ভেসে উড়ে বেড়াচ্ছে তারা মাছ খাঁড়া মাছ তীর পোকা কাঁচ পোকা শাঁখ সাপ কতধারা জীব, তাদের গা দিয়ে রঙিন ফোয়ারা আলো বেরোচ্ছে আর তার ছটায় ঝলমল হয়ে উঠছে সামনে-পেছনে অনেকখানি জায়গা— উরশিমা দেখে তার দু পাশ দিয়ে দীপ বয়ে চলেছে যেন তারা শোভাযাত্রা করে। একটু বাদেই চোখে ধাঁধা দিয়ে ভেসে উঠল বিশাল রাজপুরীপ্রাসাদ—



কত যে উঁচু আর সে যেন মেঘের ফুল দিয়ে গড়া প্রাসাদচুড়োখানা, বিদ্যুতের ফাঁস নেবে এসেছে সেখান থেকে অমন দশটা-বিশটা থাম পেঁচিয়ে, তাতে কাগজের ফুলপাতা নক্‌শা গেরো দেয়া দেয়া, তার আগে অতখানি দেউড়ী পাইন গাছ বসিয়ে সাজানো— তার সারা গায়ে চমক দিচ্ছে ফস্‌ফোরাস। দেউড়ীর গোড়ায় সোনাচুরো বালির ওপরে উরশিমাকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিল কচ্ছপ— "আসছি উরশিমা সামা", বলেই তুরিত অদৃশ্য হয়ে গেল দেউড়ীর ওপারে। পরক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে— কিন্তু সে তো আর কচ্ছপ নয়, সাজবেশ করা রূপসী মেয়েদলের আরেকজনা মেয়ে— হাতে পাখা ফুলের তোড়া, ছোটো ছোটো পতাকা নিশান, তারা দুলে নুয়ে ঘুরে নাচের ছন্দে গাইছে একগলাতে মিহিন মনকেমন একটু সুর, কান পাতলে তার কথাও কানে আসে

জল সরে যায় ভাঁটার টানে টানে
তাইতে এসে পড়লে কি এইখানে,
ও বন্ধু—
মৃদঙের মতো তাল বাজছে, সামিসেন বাজনা বাজছে পাশে পাশে
পাপড়ি ছিঁড়ে পায় ঝরে ঢেউগুঁড়ো
ডিঙিয়ে এলে সাগরফেনার চুড়ো,
ও বন্ধু—

বলে জলতরঙ্গের মতো হেসে ভেঙে প'ড়ে উরশিমার হাত ধরল এসে মেয়ের দল— "স্বাগতম্ উরশিমা সামা স্বাগতম্," বলে একজন আরেকজন তারপর আরেকজন হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল তাকে।

চলল মহলের পর মহল পার হয়ে— আড়ষ্ট বিমূঢ় উরশিমা তাদের টানে টানে রঙের পর রঙ দৃশ্যের ভেতর দিয়ে চলেছে— এই না কি সাগরপুরী? না স্বর্গপুরী? পৃথিবীর যত ফুল আকাশের যত বিজুরি আর রামধনু যেন এক হয়ে মিলেছে এসে তার চার ধার দিয়ে, তার ভেতর ঘুমকুয়াশায় জড়ানো পুরীপ্রাসাদের গায়ে সূক্ষ্ম নিপুণ কারু যেন পুড়ে পুড়ে উঠেছে—ঝরকা-বাওয়া লতার জালির ভেতরে ভেতরে কত ফুলের হাসি পাখির ডাকা ভোমরার ওড়াউড়ি, তারপর মস্ত চত্বরখানার কোণা দিয়ে আবছায়া ঘণ্টা আর দীপের রেশ ফুঁড়ে একরাশ সোনার ফুল— কাছ হতে দেখে ফুল তো নয় জরীসাজ পরা সোনার পাখা হাতে মেয়ে তারা, চুলে বাঁধা সাগরগোলাপ, সোনার ফোঁড় তোলা ওবি-ওড়নায়— উরশিমা আসতে দু ভাগ হয়ে দু দিকে দাঁড়াল তারা ফাঁক হয়ে আর মাঝখান থেকে আরেক মেয়ে— যেন চাঁদ আর ঢেউয়ের সোনালি-নীল দিয়ে গড়া দেবতাদের মেয়ে, সামনে এগিয়ে এসে মাথা নুয়ে বললে, "আসুন উরশিমা সামা—"

উরশিমার চিনতে ভুল হল না। সাগররাজকুমারী।

রাজকুমারী তার হাতে সোনালী ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে বললে,

"আমাদের বন্ধুর প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আপনি এলেন বলে সাগরপুরীর সবাই আজ ভয়ানক খুশি। থাকুন এখানে, অনেক অনেক দিন, যতদিন মন চায়, থাকুন।"

উরশিমার কিছুই বলার ছিল না, তবু মুখ ফুটে সে বললে, "আপনি?"

"আমিই তো ওতোহিমে! সাগররাজার মেয়ে।"

তারপর? উরশিমার মুখে আর কথা নেই। একটু থমকা চুপের পর রাজকন্যা বলল, "আসুন ভেতরে।"

মন্ত্রচালিতের মতো সে রাজকন্যা আর সখীদের পাঁজ পাঁজ ফুলের মাঝে পড়ে হাঁটতে লাগল পায়ে পায়ে। লাল ধরে উঠল সোনার রঙের ওপরে— ঘর উঠোন চবুতরা সব যেন প্রবাল পাথরের, চার ধারে পর্দা দিয়ে লাল ফিনিক ফুটছে, ফুল সব লাল, আলোয় লাল আভা, বাজনা গান পাখিপতঙ্গের ওড়া যেন আনচান লালিমায় মোড়া, যেন তার ঘোরে ঘোরে উরশিমা শেষ অবধি এসে দাঁড়াল একটা ফাঁকা সুন্দর ঘরে— তার এক দেয়ালে একখানা ছবি যেন ছোটো করে রাখা জীবন্ত দৃশ্যের মতো, এককোণে কোঁদাই মাটির ঘটে ঢাল হয়ে ফিরে পড়েছে বনসাই বাঁশপাতা, আর মাঝখানে যেন সবে পাতা হয়ে আছে পুরু শয্যে একখানা, উরশিমা তখন শোনে রাজকন্যা বলছেন, "বসুন উরশিমা সামা।"

বসে যেন নিশ্চিন্দি হল উরশিমা।

তারপর কত সুভোজ ভরা ভরা থালাবাটি এল চৌকি সাজিয়ে, চার ধার দিয়ে কত বাজনা আর গান আর নাচের দোলা— সাগরদোলার মতো ঘুমভারা সে দোলায় দোলায় কতক্ষণ যে সে একঠায় বসে রইল তার আর খেয়াল নেই।

সাগরপুরীতে একটা দিন তার কেটে গেল।

ঘুম যেন ভাঙতে চায় না, সারা গায়ে মাথার ভেতরে যেন নেশা— রাজকুমারী ডাকছে, "উঠুন, উঠুন উরশিমা সামা—"

চোখ চেয়ে দেখে রাজকুমারী, বলছে, "এলেন, দেখে আসুন ঘুরে-ফিরে কোথায় এলেন, যান— দেখুন ঘরদোর রাজপুরী ঘুরে দেখুন, বাগবাগিচা, পোষা পাখি—"

উরশিমা উঠল আলসে ভেঙে। দুজন সাথী নিয়ে ঘুরছে উঠোনে অলিন্দে ঘরে ঘরে— কাঠের দেয়াল পাষাণ মেঝে দোরমুখে কাগজের পুতুল ড্র্যাগনমূর্তি, এক দেয়ালে ছবি এক-একখানা যেন জীবন্ত দৃশ্য— ঝরনার পাশে ঢ্যাঙা ঘাস আর ফড়িঙ, কোথায় ফ্যাকাসে চাঁদের আলোয় ধু ধু করছে একখানা চালাবাড়ির চার পাশ দিগন্ত অবধি, কাগ নাইছে বর্ষাখাওয়া শাকপাতায় ঘেরা ডোবাপাড়ে বসে— বাগিচায় নেবে গিয়ে ঘুরছে ভিজে সবুজ মাড়িয়ে, সাত ঘাস লঙ্গ ফুলে ভোমরা ফড়িঙ ঘুরছে আপন মনে, আর সে যে কত রঙ কতধারা ফুল—

ভারি খুশি হয়ে উঠছে মনটা। হাতা পাঁচিল পার হয়ে মাঠে গিয়ে পড়ল তারা। আঃ! কী ভালো লাগে হাওয়াটা! একটু গিয়ে ছোটো নদী বয়ে যাচ্ছে পাইন গাছ সুসুকু ঘাসের পা ভিজিয়ে— নৌকো বাঁধা একখানা, ছই দেয়া— কেউ নেই, নৌকো আর পাল দেখেই উরশিমার মনটা ছটফটিয়ে উঠল, নেবে গেল সে নৌকোর গোড়া অবধি—

কিন্তু কোথায় বা যাবে। এখানে তো চেনে না কিছু।

বুনো ফলের গন্ধ আসছে, চেনা লাগে গন্ধটা। একটা কাঠবেড়ালি থমকে দেখছে তাকে মুখ বাড়িয়ে, পাখি ডাকছে—

সাথীরা ডাকল তাকে, "চলুন এবারে। রাজকুমারী বসে আছেন. ঘরে যাই।"

সারা দুপুর বারান্দায় বসে বসে দেখে একধারা ফুল আর পাতা ব'র্বে পড়ছে যেন চার ধার দিয়ে। বেলা পড়ে এলে পায়ে পায়ে চলে যায় মাঠ

পার হয়ে নদীখাত ধরে বনের কিনারা অবধি— ঝিঁঝি আর জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে ফিরে এসে দেখে আলোয় আলো করে একখানা স্টেজ খাটানো— পালা হবে, নাচ হবে, রঙবেরঙ হাতপাখা খুলে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে, বিচিত্র সব মুখোশ ঘাঁটছে কেউ একপাশে— কোন্‌টা পরবে। রাতভোর কত গাথা গল্প পুরোনো কথা— সে সব সে সাত জন্মেও শোনে নি। শেষরাতে রেরিয়ে দেখে আকাশের মাঝ দিয়ে ছলছল করছে সেই স্বর্গনদী— পাখির ডানায় ডানায় সেতু বাঁধা এপারে ওপারে— তার সাগরপাড়ের গাঁ থেকে যেমন দেখা যেত, অবিকল তেমনি। তার পাড়ে সেই রাখাল তারাটা জ্বলছে এতখানি হয়ে। দাঁড়িয়ে দেখছে এক মিনিট, তখুনি রাজকুমারী বেরিয়ে এসে তার হাত ধরেছে, "বাইরে কেন? ঘরে চলুন—"

পাতা গজিয়ে উঠল গাছ ভরে। কুঁড়ি ধরল, ফুল ফুটল; ঘর-ঘেঁষা পাখির ঘর ভরে উঠল নতুন ফোটা পাখির কলকলানিতে। রোজ উৎসব সাগরপুরীর দেশে, নিত্যি নতুন কিছু— পুতলি পরব, তারা পরব, চাঁদ দেখার ফুল দেখার পরব, কোনোদিন দুপুর গড়িয়ে চলেছে ছোটো ছোটো পদ্য বাঁধার আড়াআড়ি— বেলা পড়লে কত নাচ কত গান আর বাঁশি-বীণের ঝঙ্কার, কত পালা কত গল্পকথার জোয়ার— উরশিমা কি কোনোদিন জানত এত সব? বড়োমানুষ জমিদারদের ঘরে কত কী হয়, কিন্তু কী যে হয় তা কি জানত? কী যে হয় তার দু এক কথা শুনেছে এক-একবার— গল্প ব'লে শুনেছে, আবার ভুলেও গেছে।

মনে হতেই মনটা যেন ঘোর করে ওঠে, কিছুতে আর গা লাগে না। কিন্তু কতক্ষণ আর। তখুনি রাজকুমারী পাশে এসে বলে উঠেছে," চলুন যাই আজ আর-এক জায়গায়। নদী বেড়াতে যাবেন?

জলের কথাতে ভারি উৎসাহ উরশিমার। নৌকো সে নিজেই বায়— রঙ করা কাঠের ঘর, ভেতরে টুং-টাং শব্দ উঠছে রেকাবি সাজাবার, সে আওয়াজ ছাপিয়ে বাতাস ঘা দিয়ে ওঠে সামনে সাদা ফুরফুরে পালে। জল

যেন আপনি ঠেলছে নৌকোখানা— যেতে যেতে দেখে দু ধারে সার দিয়ে চলেছে লাল নীল মাছের ঝাঁক, মাথায় নুয়ে আসছে পাড়ের ডালপালা, পাখি গাইছে সারা পথ তিনটে দুটো সুর বদলে বদলে, উরশিমার মনে হল একটু কান করলে গানের কথাকটাও সে বুঝতে পারবে।

একদিন রাজকুমারী বলে, "চলুন একটা নতুন ঘরে আজ আপনাকে নিয়ে যাই।"

"এখনও বাকি আছে নাকি নতুন ঘর?"

"থাকবে না? কটা দিন বা এসেছেন বলুন। কটা কী আর দেখেছেন সাগরপুরীতে? চলুন, দেখে আসি—"

ব'লে কোথা দিয়ে কোন্ ধারে পুরীর এক দিকে একটা মস্ত আবছায়া হলঘরের ভেতর রাজকুমারী নিয়ে হাজির করলেন উরশিমাকে। তার চার দেয়ালে বড়ো বড়ো চার জানলা পুরু পর্দা দিয়ে ঢাকা। "আসুন—" ব'লে পুব জানলার কাছে গিয়ে পর্দা ঠেলে সরিয়ে দিতেই— ও কী! উরশিমা দেখে তার চোখের ওপরে সীমানা অবধি একটা সোনার ছটা— একটু একটু করে ফুটে উঠল মাথা ছাওয়া রাশি রাশি ফোটা ফুল— চেরী, সাকুরা ফুল! তাই্ তো। কত বার গাঁ সুদ্ধু দল বেঁধে দেখতে গেছে হানামি পরবের কালে, কত হাসি গান খাওয়াদাওয়া—

"খেয়ে নিন এটুকু—" চমক ভেঙে উরশিমা দেখে এক মেয়ে এনে ধরেছে মধুর বাটি— "খান, খুব ভালো, মোমো ফুলের মধু—"

খেতে পরে সারা গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে আনন্দে।

একটু একটু করে ছবি বদল হয়ে যাচ্ছে চোখের ওপরে— বন করে উঠছে আরো গাছ— মোমো গাছ ফুজি গাছ আজেলিয়া, তার ডাল থেকে ডাল থেকে কিচিমিচি করছে পাখি আর পাখি— বসন্তের মিষ্টি আঁচ হাওয়া এসে গায়ে লাগে, ঘুম ধরে যায়।

পরদিন ফের গেছে সেই ঘরে। রাজকুমারী বলছে, "আসুন এদিকে—"

বলে পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন এবারে দক্ষিণ জানলার। জানলা খোলা পেতেই ঝাঁক দিয়ে বর্ষার গুঁড়ো এসে শিরশিরিয়ে দিয়ে যায় সমস্ত শরীর, বাইরে চেয়ে দেখে মেঘলা করে আছে— একটানা হালকা বর্ষার কোথায় যেন ঘন হয়ে ঝোরা বয়ে পড়ছে ঝমঝম করে, নাকি ভরা নদী উছলে উঠছে— তার আওয়াজ! উরশিমা দেখে এককোণায় জল খেয়ে কালো হয়ে আছে বাঁশঝাড়। তার নীচে পুকুরপাড়ে পাখি ভিজছে ঝাপুস হয়ে— ফুঁ দিয়ে দিয়ে ভেসে উঠে ডুব দিয়ে পড়ে মাছ একটার পর একটা— কত বড়ো পুকুর, যেন দিঘির মতো। তখুনি উরশিমা শুনতে পায় বর্ষার ঠিক ওপিঠ দিয়ে যেন বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে কেউ— টানা ভাঙা-ভাঙা সুর একটা, শুনতে শুনতে সময় যে কোথা দিয়ে বয়ে যায় সে আর খেয়াল নেই।

পরদিন, উরশিমা ভাবছে জানালার বাইরে আছে নাকি অমনি বর্ষার দেশ, বসন্তের দেশ? রাজকুমারী আসতেই সে উঠে দাঁড়াল।

"যাবেন তো আজকেও?"

"আজ কী দেখব?"

"চলুন না দেখি", বলে রাজকুমারী ঘরে গিয়ে খুলে দিল পশ্চিম জানালা। ধক্ করে চোখে এসে লাগে আরেকধারা আলো। ঠাণ্ডা আলো। রঙ ধরে নি রোদে, কুয়াশায় আবছায়া করে আছে, তারই ভেতর চড়ুই ওড়াউড়ি খেলছে চুড়ো করা ধানের গাদায়, ধান ভানার শব্দ উঠছে বাতাসে। একটা পুকুর দেখা যায় সামনে কোণা দিয়ে— শালুকের ফোঁটা দেয়া দেয়া, চার পাড়ে ঢোলা ঢ্যাঙা ঘাসের বন। ফড়িং খেলে বেড়াচ্ছে দশটা বিশটা অসংখ্য, সাগরপাড়ের গাঁ নয়, যেন ভেতরকার কোনো দেশ, তবু উরশিমার কেমন যেন চেনা মনে হয়। সাদা হলুদ বড়ো বড়ো কিকু ফুল শোভা করে আছে একধারে। দূর দিয়ে মনে হয় যেন মা চলেছে তার ছোটো ছেলেটাকে হাতে ধরে— ছায়ার মতো দেখা যায়— অমনি মানুষ, ছোটো ছেলে তো দেখি নি এখানে, "এ কোন্ দেশ?"

"বলুন তো দেখি?" রাজকুমারী হাসছে মুখ টিপে।

"কাল যে দেখলুম অত বর্ষা, আজই ফের শরৎ শেষ হয়ে গেল--এ তা হলে কোথায়?"

রাজকুমারী হাসছে। "বলুন তো দেখি?"

পরদিনে দুয়ে গিয়ে খুলে দিল উত্তরের জানালা।

খুলতেই ছন্দে ছন্দে আকাশ বাজিয়ে আড়াআড়ি উড়ে চলেছে বুনো হাঁসের দল, তাদের ডানার ঝাপটানি সশব্দ হয়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে। তা হলে ওড়ার সময় এসে গেল গর্মি দেশের দিকে? শেষ চন্দ্রমল্লিকার রোগা কটা দল বাঁশের বেড়া আঁকড়ে লেগে, যেন অসময়ে ফুটতে লাল হয়ে গেছে। দুটো পাখি নুয়ে লুটিয়ে গা ঘষছে মাটিতে, উরশিমা দেখে মাটি সাদা ধরে গেছে বরফগুঁড়োয়। দূরে দূরে হাড়কঙ্কাল বের করে ফেলেছে বড়ো বড়ো গাছ— এক ডালে বাজ উড়ে বসল ছোটো একটা পাখি শিকার ধ'রে। লম্বা গাছগুনোর দাঁড়ায় হিম এঁটে আছে গোট-গোট হুকের মতো, হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে উত্তুরে হাওয়া এসে।

উরশিমা বলে, "জানলা দিয়ে দিন রাজকুমারী, শীত করছে।"

রাজকুমারী পর্দা টেনে দিলেন।

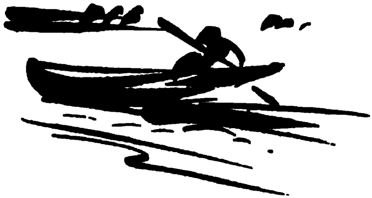
কত শীত কত গ্রীষ্ম বসন্ত বর্ষা কেটে গেল তারপর। পাহাড়ী পাপিয়া ডেকে গেল গলা ভেঙে, চেরি ফুলে সোনা হয়ে উঠল আকাশ বাতাস। কমলামঞ্জরীর গন্ধ ভেসে উঠে মিলিয়ে ফুরিয়ে গেল। বর্ষার ঢেউ রাতভোর আছড়ে পড়ল ঘুমোনো বালিশে। কত তান্‌কা-পদ্যের লেখা ওড়াউড়ি করে হারিয়ে গেল ঘাসের জঙ্গলে। বসন্ত যায়, গ্রীষ্মের তাপ বাড়ে—

বাঁশডাল পুরে উঠছে পাতায়, সিঁড়ির ধাপে ধাপে দল খুলে রাঙা হয়ে উঠছে গোলাপ। একদিন উরশিমা ঘুম ভেঙে উঠল, তার মাথা চাপ হয়ে আছে মাছের আঁষটে গন্ধে। শেষরাতে হঠাৎ মস্ত সাগর যেন দুলে উঠেছে তাকে সুদ্ধু নিয়ে— মনে হয় কাছেই কূলে কোথায় বেলে গাঁয়ের পাড়ে নুন জ্বাল দিচ্ছে জেলেরা— তার ধোঁয়ায় ঘুম ভরে গেল, দেখে ধোঁয়ার ভেতর থেকে ফুটে উঠে মাছখাওয়া সাগরপাখি চক্কর দিয়ে উড়ছে মাথায়, তাদের সাদা গা আর ডানা, লাল ঠোঁট আর পাদুটো যেন বারবার ঘষা খেয়ে যাচ্ছে নৌকোর গলুইয়ে। ঘুম ভাঙতে বুঝতে পারে সে তারই নৌকো। সুমিনোয়ে সাগর, তার মিজুনোয়ে গাঁ, তার জেলেপাড়ার ঘরখানা, দোরগোড়ায় মা দাঁড়িয়ে অপেক্ষাতে, আর বাবা নাগাড়ে বকছে ভেতর থেকে— সব পরের পর ভেসে উঠতে থাকে চোখের ওপরে। আর, আগে-রাতের গানঘরের দেয়ালি বাজনা, এত দিনের চার পাশ ভরা শোভা সুখ উৎসব আমোদ— এক মুহূর্তে যেন বিস্বাদ হয়ে গেল উরশিমার। বারবার মনে হতে লাগল সেই মাছের খালুই ঝুলিয়ে শিস দিতে দিতে ঘরে ফিরছে, কত কে ডাকছে শুধোচ্ছে সারা পথ— উরশিমা কী মাছ পেলি? কত লোককে খুশি করে দিচ্ছে সে দুটো শাঁখ ঝিনুক জলের গেঁড় হাতে গুঁজে দিয়ে— দোরে যেতে হাত থেকে বোঝা নাবিয়ে নিলে মা, বলছে, কাল আর বেরোস নি রে বাবা, বড্ড ধকল করছিস ক্রমাগত কটা দিন ধরে—

উরশিমার চোখে জল এসে গেল।

রাজকুমারীকে পেয়ে সে আর লুকোয় না। "মনখারাপ লাগছে রাজকুমারী। বাড়ি যাব।"

বাড়ি যাব শুনে রাজকুমারীর মুখটা কালো হয়ে ওঠে। মনে হল সে যেন বলতে চায়, কেন যাবে গো! কী অভাব, কিসের কষ্ট এখানে উরশিমা সামা? কিন্তু সে কথা না বলে রাজকুমারী বলে, "যাবেন বৈকি। সব গোছ করে দেব আমি। আজই যাবেন?"



আজই, এখুনি যদি যেতে পারি—

বলেই উরশিমার মনে হয়, এমনি করে বলা বোধ হয় ঠিক হল না, কিন্তু কথা সে ফেরাবে কী করে? মাঝপথেই সে চুপ করে গেল।

মনে হল রাজকুমারী যেন বলতে চায়, এত কষ্টে ছিলেন এখানে উরশিমা সামা? কিন্তু সে কথা না বলে রাজকুমারী বলে, "বেশ তো, আজই সব যোগাড় করে দেব যাবার।"

উরশিমা তখন বলে, "আমায় ভুল বুঝবেন না রাজকুমারী। একবার খালি মাকে বাবাকে পড়শিদের বন্ধুদের গাঁটুকু ঘরখানা বুড়ি-ছোঁয়া ছুঁয়েই ফের ফিরে আসব, কেবল কটা দিন—"

মনে হয় রাজকুমারী যেন কিছু বলতে চায়, কিন্তু সে কথা না ব'লে বলে, "বেশ তো, যখুনি ইচ্ছে হবে ফিরে আসবেন, তারও যোগাড় থাকবে।"

উরশিমা বলে, "মাত্র দুটো, তিনটে, কটা দিন কেবল, রাজকুমারী।"

রাজকুমারী বলে, "বেশ তো।"

যাবার বেলায় মেয়েরা কত মণিপাথর অমূল্য সামিগ্রি দিলে ঝোলা ভরে। উরশিমা যখন মেয়েদলের ঘেরা হয়ে দাঁড়িয়েছে গিয়ে জলপাড়ে,

কচ্ছপ তার মস্ত পিঠখানা পেতে অপেক্ষায় চেয়ে আছে জলের গোড়ায়, রাজকুমারী পেছন থেকে ছুটতে ছুটতে এসে তাকে ধরে দিলে সুন্দর একটা সাজের বাক্‌শো। "এটা নিয়ে যান উরশিমা সামা, সাথে করে রাখবেন সারাক্ষণ।"

সুন্দর কারু করা একটা সাজের বাক্‌শো, ওরা বলে তামাকুশিগে। উরশিমা সে বাক্‌শো নিয়ে বুকে চেপে ধরল। আর রাজকুমারী ফুঁপিয়ে উঠল এতক্ষণে।

তারই মধ্যে যাত্রা শুরু করলে কচ্ছপ। রাজকুমারী ছুটে এসে পাড়ে দাঁড়িয়ে বলছে, "মাথার দিব্বি, ও বাক্‌শো কাছছাড়া করবেন না কিন্তু কখ্‌খনো—"

উরশিমা বলে, "কখ্‌খনো করব না রাজকুমারী, নিশ্চয় জেনো।"

আর— রাজকুমারী বলছে চেঁচিয়ে, "আমার মাথার দিব্বি, ভুলেও খুলবেন না কিন্তু কখনও ও বাক্‌শো—"

দূর হয়ে যেতে যেতে উরশিমা গলা উঁচু করে বলে, "খুলব না রাজকন্যা—"

রাজকন্যা তখন চেঁচিয়ে বলছে, "আপনার জন্যে আমরা পথ চেয়ে থাকব, উরশিমা সামা—" বলতে বলতে সাগরপুরীর নিশানা হারিয়ে ঘন কালো চাপ জলের খালি দোলা, উপুরিউপুরি জলের পরে খালি জল। আর কিছু নেই।

উরশিমাকে গাঁ-পাড়ে নাবিয়ে দিয়ে কচ্ছপ বলে, "যখনই ফিরবেন এখানে এসে তিন বার হাঁক দেবেন 'আমি উরশিমা—' বলে। তখুনি দেখবেন আমি হাজির। বেশি দিন করবেন না।"

না না, কটা মোটে দিন। তুমি দেখো, এই দু-একদিনের ভেতরেই এসে হাঁক দিয়েছি— "এসেছি গো, কে আছো নিয়ে যাও—" উরশিমা

হেসে উঠল ফুর্তিতে। তারপর গাঁ বসতের মুখো মুখ করে হাঁক দিয়ে ওঠে, "আমি এসেছি গো— কে আছো, কোথায় আছো, আমি উরশিমা, তোমাদের উরশিমা তারো—

"ভেবেছিলে জলে ডুবি হয়ে গেছি, তাই না? দেখ কী এনেছি সব্বায়ের জন্যে—" বলে উরশিমা তার মণি মাণিক্য অমূল্য সামিগ্রির ঝোলাটা ঘাঁটতে থাকে হাত ডুবিয়ে।

এক দণ্ড বাদে সাগরমুখো ফিরতেই ঢেউ বাড়ি দিয়ে পড়ল পাড়ের ওপর থেকে যেন তার বুকের ওপরে— সাদা ফেনার আঁজি দেয়া দেয়া খালি নীল আর নীল, কচ্ছপ চলে গেছে। ভারী পায়ে উরশিমা বালিপাড় ধরে উঠতে লাগল পাড়ার ভেতরে।

হাঁটছে তারপর। এক পাড়া, আর পাড়া— লাগোয়া দুধারি চালাবাড়ির মাঝ দিয়ে পথ। দুটো-চারটে ছেলে বুড়ো লোক জন ঘুরছে, বসে আছে ঘরের বাইরে পথে— নাঃ! কিছুই তো ঠিক চেনা লাগে না! কাউকেই তো চেনা লাগে না! এই তো এখানটাতেই তো ছিল জাহিয়ো-উহিয়োদের ঘর। ওই তো, তাদেরই ঘরের মতো— কিন্তু নাঃ, নয়। গেল কোথায় সব? আশ্চর্য! এক বার দু বার সাত বার করে চক্কর দিয়াসে পাড়াগুনো, প্রত্যেকটা ঘর। এই তো মিজুনোয়ে! একটা লোককে পেয়ে তখন জিগ্যেস করতে এগোয়, "হ্যাঁ গা কত্তা, এ কোন্ গাঁ? নাম কী?"

লোকটা বলে, "জানো না? কোত্থেকে আসছ? এ যে মিজুনোয়ে!" বলে সে সন্দেহ-চোখে চাইতে চাইতে চলে যায়।

উরশিমা আবার আরেকবার ঘোরা দিয়ে এল— সব কটা পাড়া, প্রত্যেকটা ঘর— একটার পর একটা। নাঃ। সে জায়গা তো নয়! কিন্তু নাই বা বলি কী বলে? ওই তো গাঁয়ের পাশ দিয়ে জঙ্গল ফুঁড়ে পথ উঠে গেছে পাহাড়ে, ওই পথেই তো পরবের দিনে যেত সব ঠাকুরবাড়িতে।

গাঁ শেষ হয়ে যেখানে জঙ্গল শুরু হয়েছে উরশিমা তার কাছটাতে

গিয়ে বসে পড়ল। মাটিতে আঁক কাটছে আর তোলপাড় হচ্ছে ভেতরে ভেতরে। গেল কোথায় সব?

ছেলেগুনো বা কোথায়— যারা পাড়া মাথায় করে বেড়ায় ভরদিন? মোড়লদের গেরমানি ছেলেদুটো? সব বেপাত্তা হয়ে গেল? নাকি সে ভুল গাঁয়ে এসে পড়েছে— সাগরপাড়ের গাঁ তো সব একধারা, কচ্ছপ ঠাহর করতে পারে নি নিশ্চয় জায়গা!

এমনি সব ভাবার মধ্যে এক বুড়ি বেরিয়ে এসেছে জঙ্গল ফুঁড়ে। সাত বুড়ির বুড়ি— একটু কাঠের বোঝা তাইতেই হাঁটছে নুয়ে বেঁকে কোনোমতে, উরশিমা ডাকলে, "ও ঠাক্‌মা—"

বুড়ি চাইল পিছ ফিরে।

"উরশিমাদের বাড়িটা বলতে পারো?"

"কে? কার বাড়ি?" বুড়ি এগিয়ে এল দু পা।

"উরশিমা গো! সেই জেলেদের ছেলে। চেনো না?"

বুড়ি চেয়েই আছে। উরশিমা তখন বলে, "এখেনকারের লোক তো তুমি?"

বুড়ি এসে বোঝা নাবিয়ে দাঁড়ায়, "এখেনকারের না তো কি বেগাঁয়ের লোক আমি? তুমি কে বাছা! তোমায় তো আগে দেখি নি হেথায় কখনও?"

উরশিমা বলে, "আমি কে, তা বলবখনে। আগে উরশিমাদের ঘরটা দেখিয়ে দাও—"

বুড়ি তখন গালে হাত দিয়ে দেখছে তাকে নজর করে। "কী বাছা বলছ আমি বুঝতে পারি না। এ গাঁয়ের বুড়ো গুঁড়ো কারে না চিনি— বয়েস কি কম হল? কে বাপু উরশিমা। তুমি বাছা ভুল করে অন্য জায়গায় চলে এয়েছ—"

"ভুল করে? বলছ কী গো ঠাক্‌মা! এখানেই, এরই মধ্যে কোথাও আছে ঘরটা। তুমি জানো না তাই বলো।"

"আমি জানি না?" বুড়ি রেগে ধেয়ে এল আরো সামনে।

উরশিমা তখন ভাবছে, ওই তো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শুঁড়ি চলে গেছে পাহাড়ে— ওই তো সে গাঁ ঘুরে পিছবাগ দিয়ে চলা পথটা— ওই তো একদিকের কতকেলে চেনা ঘরচালাগুনো— সব যেন ধন্দ লাগছে— লোকগুনো যেন সব অন্য লোক! কিন্তু ওই তো সে মস্ত ঝুপুসি গাছটা মোড়ের মাথায়— ওই তো এইটুকু সাদা হয়ে দেখা যাচ্ছে সেই ঠাকুরের থান, পাহাড়ের সেই মাথায়—

বুড়ি তখনও একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে তাকে, মুখে বিড়বিড় করছে, উরশিমা, উরশিমা— তারও মাথায় ভিড় করেছে কী যেন সব কথা, "উরশিমা বলছিলি তো বাছা? উরশিমা? হ্যাঁ, শুনেছিলুম তো—"

"শুনেছিলে?" উরশিমা লাফ দিয়ে ওঠে।

"হ্যাঁ রে বাছা, মনে পড়ছে। কিন্তু সে তো গল্প! ঠানদিদি বলত ঘুমের বেলায় কত গল্প, পরনকথা— চালাক খরগোশের গল্প, চাঁদের মেয়ে জ্যোচ্ছনার গল্প, উকি ফুলের গল্প, উরশিমার গল্প— হ্যাঁ রে, উরশিমা তো সেই ছেলে, কচ্ছপের পিঠে চেপে সাগরে উধাউ হয়ে গেল? উঃ! ধন্যি ছেলে! তা সে তো আর বাছা ফিরে আসে নি! ঠানদিদি বলত, সাগরপুরীতে তাকে নাকি আটক করে রেখেছিল ওরা যাবজ্জীবন— সে তখন কত ছোটো আমি, কত গল্প বলত ঠানদিদি বিনিয়ে বিনিয়ে— সব কি আর ছাই মনে আছে! তা বাবা তুমি সেই উরশিমাকে খুঁজছ নাকি এখানে?" বলে বুড়ি তার তোবড়া গাল ভর্তি করে খট্ খট্ আওয়াজ করে হেসে উঠল।

"খোঁজো বাবা, খোঁজো—" বলে বুড়ি তার কাঠকটা তুলে নুয়ে বেঁকে চলে গেল সামনে দিয়ে। আর ফিরেও তাকাল না।

ভয়ে হতাশায় উরশিমা যেন এইটুকু হয়ে গেছে ততক্ষণে। বলে কী বুড়ি? মাথার ঠিক আছে তো? কিন্তু সেই বা কী করবে এখানে— যাবে? না কি, সাগরপাড় ধরে পাশে গাঁয়ে দেখবে গিয়ে? নাকি ফের ডাক দেবে

গিয়ে কচ্ছপকে? সে কি সত্যিকার নয়? সে নাকি গল্পের ছেলে? উরশিমা নিজের গায়ে চিমটি কাটল। লাল হয়ে জ্বালা দিয়ে উঠল চামড়া। তা হলে সে কি মিথ্যেকার? কিন্তু সে তো সত্যি গিয়েছিল কচ্ছপের পিঠে চেপে সাগরে। সে তো সত্যি ফিরল এতদিন পরে! কত দিন হবে, দু বছর? তিন বচ্ছর? তার বেশি তো নয়। কত বয়েস তার এখন? আঠারো? বিশ? একুশ? না না, অতও নয়। ঘোরে ঘোরে চলে গেল ভেতর দরিয়ায়— সাগর তো তার জন্মকেলে চেনা! সে কি পথ হারিয়ে ফেলবে অতই সহজে? কিন্তু কচ্ছপ এসে ডাকল মানুষগলায়। কত মাছ সাপ শাঁখ তাকে ডাকতে লাগল মানুষগলায়। আর সেই অপরূপ রাজপুরী। সে কি জলের তলার দেশ? তবে জল নেই কেন সেখানে? সেই রূপসী মেয়ের দল, রাজকুমারী, রাজকুমারী ওতোহিমে— যেন জ্যোৎস্না আর সাগরের নীল ছেনে গড়া গায়ের রঙ— গানঘরের সেই সোনালি-রুপুলি সুরের মায়া— কত পালা, নাচ, গান, কত বিচিত্র বাজনা— বসে বসে উরশিমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। সেও কি সত্যিকার সব? আর, যারা তার নিজের জন— তারাও কি সত্যি তার নিজের জন? তার বাবা মা জ্ঞাত বন্ধু পড়শি— সত্যিকেরে? উরশিমার হঠাৎ মনে হল কে যেন তাকে ঠেলে দিয়েছে হঠাৎ চুড়ো থেকে অতল পাতালের তলায়— সে পড়ছে, পড়ছে ধোঁয়া-ধোঁয়াকার শূন্যের ভেতর দিয়ে— নেবে যাচ্ছে আরো অতলের তলায়— উরশিমা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। দু হাতে জঙ্গলের কাঁটা পিষতে উলতে লাগল মুঠো করে, রক্ত ফুটতে লাগল হাতের দুটো পাতা ভর্তি— উরশিমা বুক ভাসিয়ে কাঁদতে লাগল পথের ওপরে বসে।

কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে তারপর উঠে দাঁড়াল সে ফের। বেলা পড়ে আসছে। নিজেকে তৈরি করে নেয়, না, সে ফিরেই যাবে। হোক সে গল্পেরই ছেলে, এখনকারের সে কেউ না। মনে ভেসে ওঠে— আসার সময় কালো মুখ করে সেই যে দাঁড়িয়েছিল রাজকুমারী, সেই যে কেঁদে ফুঁপিয়ে উঠল

কচ্ছপ যখন যাওয়া শুরু করেছে— পায়ে পায়ে সে সাগরপাড়ে নেবে গেল পেছন্ থেকে মুখ ফিরিয়ে দিয়ে।

দিন পাটে বসেছে। একটানা ঢেউয়ের নীলে-সাদার ভেতর গোলাপি লাল ছড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। বাতাস নেই। চরাচর থুম্ হয়ে আছে যেন কিসের আশঙ্কাতে। জলের গোড়ায় নেমে গিয়ে উরশিমা চেঁচিয়ে উঠল, "কে আছো নিয়ে যাও, আমি উরশিমা—"

যেন তার ডাকে সাড়া দিয়ে বড়ো এক সার ঢেউ পাড়ে এসে পড়ল বাড়ি খেয়ে।

আবারও ডাক দিয়ে উঠল ভরা গলায়, "কে আছো গো আমায় নিয়ে যাও—"

আরেক সার ঢেউ উঠে এল ওপর অবধি, এক গাদা শাঁখ-ঝিনুকের খোলা রেখে ফিরে গেল ফের।

উরশিমা আবারও ডাক দিয়ে উঠল। আবার। আবার। এক ধার থেকে আরেক ধার পর্যন্ত যায়, গিয়ে ডেকে ওঠে— "কে আছো আমায় নিয়ে যাও—"

সূর্য ডুবে গেল। ছায়া পড়ে এল আকাশ জল ডাঙা একাকার করে। পেছন থেকে গাঁয়ের শব্দ বড়ো হয়ে উঠছে এক-একবার। উরশিমার মনে হল, দূর পেছনে পাহাড়ের সেই পুজোবাড়ির ঘন্টা বজেছে— কতদিন দল বেঁধে গেছে সব ডালা দীপ নিয়ে, শিমে দড়ির ঘেরা দেয়া উঠোনচত্বরে ধূপের ধোঁয়া উঠছে চারধার সুগন্ধ করে— উরশিমার হঠাৎ মনে পড়ে, তাই তো! তার কাছে তো সাজের বাক্শোটা আছে রাজকুমারীর। এমনি ভেবেই কি উপহার বলে রাজকুমারী দিয়েছিল তাকে? মনে হতে যেন আশ্রয় পেয়ে গেল একটুখানি— ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল সে বাক্শো। দ্রুত হাতে খুলতে বসল ডালা— হাত কাঁপছে।

জোরে টান দিল— আরো জোরে— রাজকুমারীর দিব্বি তার মনে

পড়ল না। আঁট ডালা খোলেও না ছাই সহজে, আরো জোর টান দিল ডালা ধরে—

আর ঝটকায় ডালা খুলে আচমকা ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একঝলক নীলরঙের ধোঁয়া—

পাক দিয়ে উঠতে লাগল তাকে ঘিরে। উরশিমা হঠাৎ শুনলে বাবা ডাকছে তাকে, "দেখে যা কাল কতগুনো গাছ লাগিয়েছি এধারে—"

"কী গাছ লাগালে দেখি—" উরশিমা লাফ দিয়ে যেতে গিয়ে শোনে মা বলছে, "দুটো গোটা দিন সাগরে কাটিয়ে এলি, তোর ভয় লাগে না রে?"

"কিসের ভয় গো মা!"

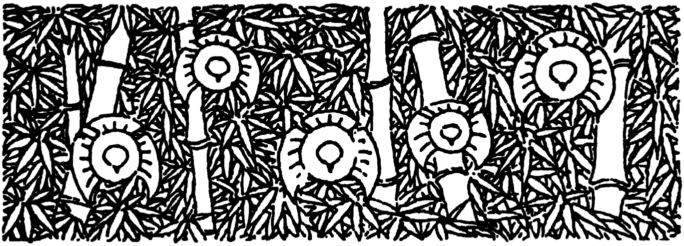
"ও মা! অজানা সাগরে কত ভয় আছে, জানা-অজানা কত ভয়— ব'লে মা এসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে হঠাৎ, উরশিমা শোনে পাড়ার ছেলেরা ডাকতে এসেছে তাকে, "উরশিমা— ওরে উরশিমা— এলি? শুনে যা একটা কথা—" দেখে জোহিয়ো উহিয়ো— মোড়লের সে ছেলেদুটো এগিয়ে আসছে জোর পায়ে— তখুনি পাহাড়ের ওপর থেকে পুজোর ঘন্টা বাজতে শুরু হল গভীর তীক্ষ্ণ একটা কনকনে আওয়াজ তুলে—

আর তারই মধ্যে উরশিমার খেয়াল হল বাক্‌শোর নীল ধোঁয়া পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে তাকে ঘিরে ফেলছে যেন, আর জলের গোড়ায় রাশবশহারা কেমন একটা জন্তুর মতো সে যেন চেয়ে— কী যেন সে ভাবছে তখনও। সাগরপুরীর সে পেল্লায় ঘরগুনো? বাগিচার অত অত ফুল? আসার বেলায় রাজকুমারীর সে কালো মুখখানা? গা ভর্তি ভারি জ্বর জ্বালাপোড়া করছে, বুজে আসছে মাথাটা। হঠাৎ, চোখের ওপরে দেখে শুকিয়ে পাকিয়ে উঠছে তার হা-পাগুনো, আঙুল সব কুঁকড়ে গেল, বেঁকে নুয়ে পড়ছে শিরদাঁড়া— সে টের পায় ভাঁজের পর ভাঁজ পড়ছে তার ছেলেমি মুখখানায়, ঝলমলে চোখদুটো ঘোলা আবছায়া হয়ে যাচ্ছে— তার সামনে দিয়ে শয়ে শয়ে

সাগুরে পাখির ঝাঁক ডানা দাপিয়ে উড়ে যাচ্ছে যেন তার দশ বিশ একশো দিন আর বচ্ছর একটা একটা করে ঠুকরে ছিঁড়ে নিয়ে— তার বাবা মা জ্ঞাত জন বন্ধুরা হঠাৎ এসে দাঁড়িয়ে উঠল সামনে— মুছে গেল তখুনি জলের লেপা খেয়ে, তার পুরোনো ঘর ধসে ভেঙে মাটি হাঁ করে পড়ল, আর দেখছে সে জঙ্গল যেন গিলতে গিলতে এগোচ্ছে গোটা পাড়া— সারা দেহ দিয়ে সে এখন বুঝতে পারে তার বয়েস বাড়ছে হু হু করে. . . শিরাগুনো দড়ি-দড়ি হয়ে উঠল, মাস খসে গেল— চুল উবে গেল— একটা লহমার ভেতরে দশ বিশ একশো দুশো বচ্ছর পার হয়ে সে থুবড়ে পড়ল শোষা সাদা একটা কঙ্কালের মতো।

পুরোনো জাপানী কবিতায় উরশিমার গল্প শেষ হয়েছে এই রকমের কটা লাইন দিয়ে—

আহা, বোকা ছেলেটা গো!
থাকতে পারত চিরসময়ের দেশে,
ফুল-ঝরা বীণ-মূর্ছোনো চিরদিন!
মরতে আবার মেছো গাঁয়ে ফেরা কেন?
আঁষ মাটি, আর ঝুরো বালি হাওয়া-ওড়া—
এত টান নাকি বাপ-মার, বন্ধুর?
হাভাতে বাপমা-পড়শি তাদেরই এত টান এত টান!
আহা, বোকা নির্বুদ্ধি গাঁয়ের ছেলে. . .



আদাচিগাহারার ডাইনী

মাৎসু দেশে আদাচিগাহারা বলে রুক্ষু ঝাড়-শিলা ওঠা তেপান্তর মাঠ আছে একখানা। সারাদিন রোদ পোড়ে সে মাঠে— নেড়া গাছে বেজে বেজে, সারারাত সাদা হিম কনকন করে বয়ে যায় এপারে ওপারে— একা কেউ পেরোয় না, দল বেঁধে চলতে বুকে যেন বাড়ি পড়ে পায়ে পায়ে। চার ধার গাঁয়ে পাঁজ কাটতে, কুয়োপাড়ে জল তুলতে মেয়েরা চোখ বড়ো বড়ো করে বলে— ডান গো দিদি, ডান! সত্যি বলছি, মাঝরাতে আগুন-চুল উড়িয়ে ছুটছিল ডান, স্বচক্ষে দেখিছি। শেষরাতে বাইরে বেরিয়ে শুনি বাতাস কেটে কেটে বসছে শিস দিয়ে, আর সে যেন চোখে ধাঁধা দেয় জ্বলন্ত চিকুর কেটে— ঘরে ঢুকে দোর দিয়ে তাও কাঁপুনি যায় না গো। এ গাঁয়ের ও গাঁয়ের কত লোক গেছে, আর ফেরে নি। ফেরা পথে কত জন দেখেছে একটা নেকড়েপাল যেমন প্রাণভয়ে ছুটেছে মাঠের ভেতরমুখো— বুকফাটা ডাক ডেকে উঠল হঠাৎ, ব্যাস্! আর তাদের দেখা গেল না। দড়ি-বালতি হাতেই ঝুলছে, চরকা রয়ে আছে হাত পড়ার অপেক্ষাতে। ওদিক চাইতে গেলেই গা-হাত যেন আপনা থেকে আলগা দিয়ে পড়ে। এমনি ডাইনীর মাঠ! কত না-জানা পোথো, গাছকাটা কাঠুরে, ঘরতাড়ানো ছেলে সুন্‌সান্‌

হয়ে গেছে— আহা গো!

ঘট-কমলির ঝোলা আর একগাছা আসা-লাঠি হাতে এক সাধু ঘুরতে ঘুরতে বিমনা হয়ে একদিন ঢুকে পড়েছেন— তো হেঁটেই চলেছেন, আরেকখানা গাঁয়ের আর দেখা নেই। দিন মিলিয়ে গেল, দেখতে দেখতে মুখ আগলে এল এতখানি একখানা পেতলের টাটের মতো গোল চাঁদ— তার ঠাণ্ডা যেন হাড়ের ভেতরে সেঁদোয় গিয়ে, গিদ্ধড় কমলিখানা খুলে জড়িয়ে বুকে চেপে ছুটবেগে চলেও কাঁপুনি যায় না। তো চলছেনই। গাঁয়ের সাড়া নেই কোনোদিকে। মাথায় বুঝ নেই, খিদেতেষ্টার বোধ নেই, তবু যেই মনে হয় পা দুটো আর চলেছে না, পেছনে থেকে ঠাণ্ডা এক-একটা দমকার ঠেলা লাগে— এমনি যেতে যেতে রাত যে কত হল সে আর হুঁশ নেই, পা দুটো চলছে যেন যন্ত্র।

হঠাৎ কতকগুনো গাছের ফাঁক দিয়ে ফ্যাকাসে একটা আলোর রেখা চোখে পড়েছে, পড়তেই সাড় ফিরে এল। গাঁ এসে গেছে?

আলোর মুখে খানিকটা যেতে দেখেন, বড়ো বড়ো চাঁই পাথরের পাঁচিলের ভেতরে একটা চালাঘর, আলো বেরোচ্ছে তার জাফরি দিয়ে। কিন্তু

সাড়া নেই তো কোথাও! আশপাশে চেয়ে দেখেন আর-কোনো বাড়িঘরের চিহ্নও তো নেই। তা হলে আচমকা একখানা ঘর কী বলে উড়ে পড়েছে মাঠের মধ্যিখানে?

হোক-গে যা হোক, আর ভাবতে ইচ্ছে যায় না। তবু তো রাতের আশ্রয় একটা। পাঁচিল পেরিয়ে দোরমুখো যেতে দেখেন দোর হাট খোলা— লোক কই?

"কে আছো?"

সাড়া নেই।

দরজায় আসা বাড়ি দিয়ে আওয়াজ করে উঠলেন, "কে আছো ঘরে?"

কারও সাড়া নেই।

তখন সাহস করে ভেতরে ঢুকে দেখেন কোণায় কাঠ পুড়ছে, একদিকে কুলুঙ্গিতে একটা দীপ দপ্‌দপ্ করছে, মাঝ দিয়ে একটা চরকা— যেন এখুনি কেউ কাটনা কাটছিল, মাটিতে পাঁজ ছড়ানো।

ভেতরে চেয়ে আরো দেখেন মাটির তিন দেয়ালে আরো দুটো কুলুঙ্গি, এককোণে পেছন-দোরখানা দেয়া।

কাঠ জ্বলছে পুড়পুড় করে। কাছ হয়ে দেখেন তার যেন তাপ নেই।

ভেতরে কেউ আছে নিশ্চয়। সাধু তাঁর ঝোলা মাটিতে নাবিয়ে বন্ধ দোরে গিয়ে আসা ঠেলা দিলেন— ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ তুলে দোর আধখোলা খুলে চাপ অন্ধকার বেরিয়ে এল ওদিক দিয়ে।

"কে আছো ঘরে? সাধু আমি, রাতের অতিথি—"

সাড়া নেই।

সাধু হলেও, গা ছমছম করে উঠল। দোরটা টেনে দিলেন তখুনি ভেতর থেকে। তারপর, হোক-গে যা হোক, রাতটা তো কাটুক— ভেবে, দীপ উসকে, জয় বাবা অমিদা বুৎসু! বলে আসাগাছ মাথায় ঠেকিয়ে দেয়াল ঠেস হয়ে বসলেন গিয়ে আগুনের কাছটাতে।

আগুন তো বটে, তাপ নেই। যা ঠাণ্ডা! ভাবছেন, দু দণ্ড গেছে কি না, দোরগোড়ায় ঢ্যাঙা কালো একটা ছায়া—

"কে?" সাধু লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন নিরীহ রোগাসোগা এক বুড়ি, এক বোঝা কাঠ বগলে চেপে ঢুকছে বেঁকতে বেঁকতে— "কাঠ-কুটা আনতে বেরিয়েছি, তাইতেই হাড় যেন কালিয়ে যাচ্ছে— যা ঠাণ্ডা!" ব'লে বোঝা নামিয়ে দু খানা টুকরো-কাঠ নিয়ে গুঁজে দিল আগুনে। মুহূর্তে ঘরটা গন্‌গন্ কর উঠল।

সাধু তখন মনে মনে খানিক স্বস্তি হয়ে কৈফতের সুরে বলেন, "যাচ্ছিলুম, একটা ঘর-চাল কিচ্ছু দেখি না কোথাও। তোমার ঘরখানা

দেখে তো উঠলুম এসে—” ব’লে চেয়ে আছেন বুড়ির কথার অপেক্ষাতে—

বুড়ি বলে, “আহার হয়েছে কিছু বাবার?”

“আহার? বললুম না, সেই ভরবেলা থেকে হাঁটছি— একটা লোক দেখি না, একটা গাঁ পড়ল না এতখানিটা রাস্তার মধ্যে—”

“বসেন দেখি—” ব’লে বুড়ি কথার মাঝখানেই কুলুঙ্গি থেকে একখানা কাপড় টেনে পাট করে বিছোলো মাটিতে, “উঠে বসেন বাবা, দেখি কী আছে ঘরে—” বলে পেছন-দোর খুলে যেন মিলিয়ে গেল কালোর ভেতরে।

কিচ্ছু না, তবু ফের ছ্যাঁৎ করে ওঠে সাধুর মনটা।

বুড়ি এল কতক্ষণের ভেতরেই। ছোটো একটা জ্বালা উনুনের ’পরে বোকনো চাপানো, কোণায় রাখল এনে। তারপর পাত পেড়ে অন্ন বেড়ে দিল, “নেন—”

সাধু এগিয়ে বসলেন।

সবে ভাতে হাত দিয়েছেন, বাইরে ঠাণ্ডা দমকা একটা আর্তনাদ, হুউউউ—

কী ও? হাত সরে না ভাতে।

“ও কিছু না বাবা। কত পশুপাখি উঠোনের পাশ দিয়ে রাত চ’রে যায়—”

“ঘরে ওঠে নাকি?”

“না না, ওরা কিছু বলে না। আপনি খেয়ে নেন।”

ভার মনে সাধু গ্রাস তুললেন কোনোমতে। হাতমুখ ধুয়ে এসে বসেছেন, নিজের কমলিখানা খুলে পেতে একটু গড়ান দেবেন কি না ভাবছেন, বুড়ি বলে ওঠে, “রাত কাবার হয়ে এল বাবা, একটু ঘুমুতে হবে না?”

“তুমি?”

বুড়ি হেসে বলে, “আমি তো ঘুমিয়েই বাবা ভরদিন, কী আর করব

হেথায়!"

আছো কবের থেকে হেথায়? সাধুর মুখে উঠে আসে কথাটা। বলতে গিয়ে দেখেন কাঠের আঁচে কেমন ঘোর ধরে উঠেছে যেন বুড়ির মুখটা— মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। ছমছমে ভাবটা কাটাতেই যেন অনেকগুনো কথা ফের ওঠা-পড়া করে ওঠে ভেতরে ভেতরে— আছো কেন এখানে? জ্ঞাতজন নেই কোথাও? ঘর কোথায় ছিল আগে? নাম কী— মনে-মনেই ওঠাপড়া করে কথা। বুড়িই বলে ওঠে মাঝখানে, নেন, "আপনি গড়ান দেন। আমি ভেতরে যাই, দেখি—"

ব'লে, উঠল সে। সামনে-দোরে হুড়কো টেনে, পেছন-দোর আধখোলা খুলে বলে, "একটা কথা বলে যাই বাবা— একা বেরোনো নয়, কোনোদিকে মুখ বাড়ানো নয় রাত্রিবেলা, চুপ করে ঘুমান নিশ্চিন্দি হয়ে, আমি যাই—"

বলতে বলতেই পেছনের কালোর মধ্যে মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল বুড়ি।

সাধু গোটোসোটো হয়ে গায়ের কাপড় জড়িয়েমড়িয়ে, নমু অমিদা বুৎসু ব'লে ব'লে ঠাকুর-নাম জপতে জপতে আসা বুকে চেপে তো শুলেন, চোখ বোজাতে পারেন না কিছুতে। চোখের পাতা পড়লেই অমনি অন্ধকার একটা ঠাণ্ডা বয়ে যায় বুকের ভেতরে। চোখ চেয়েই তাই দীপের ছায়া কাঠের পোড়া দেখতে থাকেন শুয়ে শুয়ে। দেখতে দেখতে সময় যে বইছে সেও প্রত্যেকটা দণ্ডে টের পান বুকের ঘায়ে ঘায়ে, হঠাৎ বাইরে ফের সেই দমকা আর্তনাদ, হুউউউ—

যেন সে আওয়াজের ঠেলাতেই সাধু উঠে বসে পড়লেন। তখন দেখেন চার ধার দেয়ালে ঢ্যাঙা ছায়ার শিস যেন হাত তুলে তুলে নাচছে, কোণাতে চেয়ে দেখেন ফুঁ লেগে হলকা কেটে উঠছে জ্বলা কাঠ— কাঠ তো নয়, পুড়ে পুড়ে সাদা যেন হাড় কখানা, হাড়ে হাড়ে বাঁধন দিয়ে ওটা কী পুড়েছে? ও কি গোটা কঙ্কাল নাকি? গায়ে ছিটকে এল ধু ধু আগুনের কুঁড়ো— এত

ঠাণ্ডা কেন? ভিজে কেন? হাত ছুঁয়ে দেখেন ও মা! এ যে রক্ত—

লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন সাধু। থাক যেখানের যা, কেবল লাঠিটুকু হাতে কিভাবে হুড়কো খুলে যে উঠোনে পড়লেন, কিভাবে লাফিয়ে ডিঙিয়ে গেলেন পাঁচিল— সে আর তাঁর জানা নেই। মাঠে প'ড়ে জয়, জয় বাবা অমিদা বুৎসু— সে যেন কূলকিনারাহারা ঠাণ্ডা চাঁদের আলোর সমুদ্দুর, তারই ভেতর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সাঁতরে, না ছুটে— কিভাবে যে ঠেলে চললেন ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের দমকা—

ক পা না যেতে শোনেন— "কোথা যান বাবা—" বুড়ি ডাকছে পেছনে। ধার কনকনে গলাখানা যেন বিঁধ দিয়ে পড়ছে পিঠে। "কোথা যান বাবা—"

যত বেগে যান, আঁচ পান বিশাল হয়ে উঠছে পেছনে একখানা হাত, তাঁকে টানছে যেন— ছুটেছেন আপ্রাণ বেগে সে টান ছিঁড়ে, তাও পিঠে বেজে পড়ছে আঙুলডগা-কটা— আঙুল, না নখ? পিঠ যেন ছিঁড়ে বসছে, শিরদাঁড়া খুলে যাচ্ছে যেন দেহ থেকে—

দু হাত মেলে সাধু যেন তখন উড়ে চলেছেন কূলকিনারাহারা ঠাণ্ডা চাঁদের আলোর শূন্যে— সে ঢেউ না বাতাস, কুলকুল করে বইছে চারি পাশে, আর তার অতলবিতলের ভেতর তিনি হু হু করে ঢুকে যাচ্ছেন একনাগাড়ে—

আর তাঁর মনে নেই।

জ্ঞান হল যখন, দেখেন অকূল মাঠখানা ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদে। গা-হাত ছুঁয়ে ঘষে দেখেন, আছে, সব আছে, আসাগাছও আছে পাশে পড়ে। উঠে বসলেন সাধু। দিকসীমাহারা মাঠ, যেদিক চোখ যায় রুক্ষু ঝাড় শিলা আর ঢাল আর চড়াই, আর কিছুর চিহ্ন নেই কোথাও— কোন্‌মুখো যাওয়া এখন? হে বাবা বুৎসু ভগবান, পথ বলে দাও বাবা। সাধু হাঁটা দিলেন আসাখানা শক্ত মুঠোয় চেপে। যখন ফের বসতের দেখা পেলেন, তখন

দিন ঢলে পড়েছে।

সত্যিকেলে ঘর তো সব?

একটা লোক বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে, "কোত্থেকে আসা হচ্ছে গো বাবা।"

সাধু বলেন, "গাঁ তো? আরো লোকজন আছে তো?"

লোকটা থ হয়ে চেয়ে। তখন বলেন, "তাই বলছি, আশ্রয় পাব তা হলে আজ রাতটা।"

"থাকার জায়গা? কেন পাবেন না।"

তার উঠোনে গিয়ে ঢুকতে ছেলে মেয়ে লোক জন ঘিরে এসেছে। "কোত্থেকে আসা গো? কত বেলা বেরিয়েছেন?"

সাধু থিতু হয়ে বসে তখন বলেন, "বলছি, আগে একটু জল দাও।"

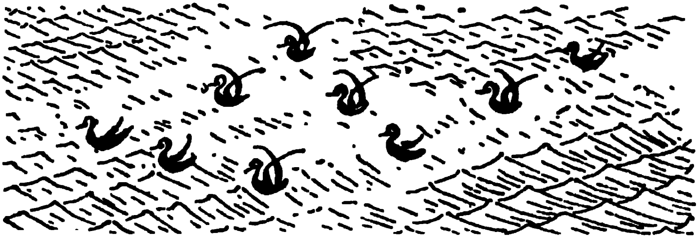
হাতমুখ ধুয়ে, ঠাকুরের নাম নিয়ে, ফল জল খেয়ে তারপর সাধু বলতে বসেন কালকে রাতের ঘটনা। চোখ বড়ো বড়ো করে শুনছে সব ছেলে মেয়ে বুড়ো যুবো।

ডান, সেই ডান—

বড়ো বাঁচা বেঁচে গেছেন গো বাবা। এ সেই আদাচিগাহারার ডান।

কেউ ফেরে নি তো কখনও ওর মুখ থেকে!

একজন বলে, "উনি সাধু না? ডানে ওঁর কী করবে! দেখছ না মন্ত্র লাঠিখানা?"



ঘুমতাড়ানি, ঘুমপাড়ানি

ঘুমতাড়ানি

ছাতা

মোগামি-র চা-শালাতে
ছাতাটা ফেলে এলাম।
তোড়ে জল এল পথ জুড়ে— বলি, থাম্!
ছাতাটা, আহা রে ছাতাটা, আমার ছাতাটা—
নেই সে হাতে।

আহা রে জীবন

নেচে নেচে নামে এতখানিখানি বরফদানা,
বর্ষাপাথর ছিটিয়ে পড়ছে এক-একখানা
পাছ-দুয়োরে
ধোঁয়া উগরে

ভাত উথলে ওঠে,
ব্যান্নন ফোটে,
লোকে ঘর ধায়,
ছেলে চেল্লায়—
আমি খুঁজে মরি হাতাখানা কোথা রাখলুম ফের—
ভ্যালা রে জীবন! আহ্য রে জীবন!
ঢের হল, ঢের!

বিষ্টি

জ্বালানে বিষ্টি, ঢের হল, থাম্ দিকি!
দেউলবাড়ির সামনের কাকি গাছটার নীচে নেমে
পাখি চেঁচাচ্ছে সেই থেকে একটানা।

তেঙ্গু মশাই

তেঙ্গু মশাই, তেঙ্গু মশাই,
একটু হাওয়া ছাড়ুন গো, দোহাই!
সুতো ছাড়ব, ঘুড়ি তুলব মেঘের ফাঁকে উড়িয়ে।
হাওয়া নেই তো বর্ষে ফেলুন সোনারুপোর টাকা—
বসে কুড়োই।

সাদা খরগোশ

দাদা খরগোশ, সাদা খরগোশ,
ঝম্প লাফিয়ে কেন ভুর্ হোস!
ভরা পুন্নিমে দেখতে গেলুম,

অমনি দু চোখে ছুটে গেল ঘুম।
ভারি লাফ পেল, কী করব! তাই
সারারাত ধরে ঝম্প লাফাই—
ঝম্প লাফাই— ঝম্প লাফাই—

এক তারা

তারা, ও মশাই তারাবাবু! নীচে চেয়ে
বলুন তো, একা একা আসা ঠিক হল?
কতগুনি তারা চাই বলুন তো এতখানি রাত ছেয়ে?
কষকালো রাত— উচিত কোথাও ফাঁক রাখা
এতটুকু?

চাঁদ

রূপুসী চাঁদ গো! ও রূপুসী রাজকন্যে!
নেমে আসুন না কান্নন-মন্দিরের চুড়োটা বেয়ে!
একবার এসে পা-র ধুলো দিন গরিব চাষির ঘরে।
কিছু না পারি তো পাতে বেড়ে দেব তপ্ত ভাতের চুড়ো!

চাঁদ বলে। না রে! ভাত খেতে সাধ নেই।
যেতে পারি গড়ে দিস তো দুখানা
চাল গুঁড়ো করে পিঠে—
সব্বার জিভ রসানো আমোচি পিঠে।

ঘুমপাড়ানি

১

খোকা ঘুমোলো রে? শুধোই বালিশটাকে।
হ্যাঁ গো ঘুমিয়েছে! দেখতে পাও আর তাকে?
শুনছ, কাঁদছে? চেঁচিয়ে তুলকালাম
করছে কি? তাকে এই তো রেখে এলাম
ঝিঁঝিঁদের দেশে, জোনাইয়ের ফুলবাগে—
দেখতে পাও আর তাকে?

২

ঘুমো, খোকা ঘুমো, চোখ বোজ, বুজে থাক,
চোখ ভরে তোর খুব ক'রে ঘুম পাক!
ও মিঠুয়া ছেলে, দেখ দিকি ঘুম পেলে
কত মিঠা লাগে! ওরে ছেলে, মিঠা ছেলে!
"কেমন মিঠা গো?" মিছরি-গুড়েরও চেয়ে।
"কেমন মিঠা?" সে চাস যদি দেখ্ খেয়ে।
পাহাড়-বেড়ানো সবজী গাছের মালা,
ঘাসের ডগায় সবজিনা বাতি জ্বালা,
রাত ভরা ওই তারার হাউইবাজি,
ফিকে-দেয়া ভোরে ফুলে ওঠা ফুলসাজি,
দুধ-ভরা শীষ খেত-ছাওয়া ধানগাছে,
তারও চেয়ে মিঠা খোকা সে ঘুমিয়ে আছে।।



ফুল-ফোটানো মানুষ

বুড়ো কাঠুরিয়া। জ্বালানি কাটতে যায় জঙ্গল পাহাড়, একদিন একটা কুকুরছানা দেখে পথে প'ড়ে— না খেয়ে, শীতে, মরণদশা।

বড়ো মায়া হল। বুকে চেপে তাকে ঘরে নিয়ে ফিরল কাঠুরিয়া— "দেখ্‌সে আয় কাঠুরেনী, কাকে এনেছি—"

কাঠুরেনী বেরিয়ে দেখে কুঁকড়োশুঁকড়ো ধবধবে একটা কুকুরছানা।

"—ও মা, কী সুন্দর কুকুরছানা। ভালোই হল, কথা কওয়ার একটা লোক বলতে নেই ঘরে। বেশ হল!"

বুড়োবুড়ির যত্নআত্তিতে দেখতে দেখতে কুকুরছানাটা তাগড়াই ধবধবে ছোটোখাটো একটা নেকড়ে বাঘের মতন হয়ে উঠল। সাদা দুধরঙের কুকুর— ওরা নাম দিল শিরো। শিরো মানে হল সাদা।

ছেলেপুলে নেই বুড়োবুড়ির ঘরে। শিরোই হল ওদের ছেলে। ফরমাশ খাটে, কাঠ বয়, গলা জড়িয়ে আদর আদায় করে। একদিন বুড়োর পেছনে পেছনে বাঁশের বনে গাছের বনে চলতে চলতে— হঠাৎ টানতে শুরু করেছে বুড়োর কিমোনো— "কী রে?"

শিরো একটা জায়গায় ঘুরঘুর ক'রে মাটি শোঁকে আর থাবা আঁচড়ে মাটি কুরোতে থাকে. . .

খানিক দেখে বুড়ো— দেখা যাক্— ভেবে কাঠ না কেটে মাটিই খুঁড়তে বসল, কী আর করা! হাতটাক খুঁড়েছে কি খোঁড়ে নি— ও মা, ঠন্ করে উঠল শব্দ। মাটি সরিয়ে দেখে কলসীর কাঁদা। কলসীই তো? হ্যাঁ। মাটি সরিয়ে তুলল কলসী— কী ভার! উপুড় দিতেই মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল পুরোনো আমলের সব টাকা— রাশি রাশি ওবান আর কোবান, নিবু আর ইশু—

ও মা, এ যে সাত রাজার ধন!

শিরো ঘুরে ঘুরে কেবলই পিঠ পেতে দেয়, কেবলই পিঠ পেতে দেয়! বুড়ো তখন খড়ের ছালা মোহর বোঝাই দিয়ে, ছালার মুখ বেঁধে, চাপিয়ে দিল শিরোর পিঠে। বুড়োর আগে আগে গরবে গরবে তন্তোকো তন্তোকো— শিরো চলতে লাগল টগবগিয়ে. . .

দুঃখ ঘুচল বুড়োর। কেবল তারই বা কেন— বুড়োর মনটা ছিল ভারি ভালো, জ্ঞাত-পড়শি যে যেখানে— বুড়ো সবাইকে ডেকে ডেকে রোজ-রোজ দিন জিনিশটা-আশটা নানান সামিগ্রি দিতে-থুতে লাগল হাত-কোঁচড় ভরে ভরে। জানা-চিনতির মধ্যে ভাত-কাপড়ের জ্বালা লাঘব হয়ে গেল অনেককারই।

লাঘব তো হল, কিন্তু বুড়োর যে ছিল সবচেয়ে পাশের ঘরের পড়শি— তার বুক ফাটতে লাগল হিংসেতে। কারণ-অকারণ খোঁজ পাড়তে আসে বিশ বার করে, বলেই ফেলল অবশেষে— "হ্যাঁ গা কাঠুরেদাদা, একটা কথা শুধুই। ক-দিন আগেও যে জ্বালানি বেচে দিন কুলোতো না তোমার, হঠাৎ এত টাকা পেলে কোন্খানে?"

ও, এই কথা! বুড়ো তার মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে শেষে বলে, "সে ওই শিরো জানে, ওকেই শুধোও। শিরোই দিয়েছে সব— যা দেখছ।"

"শিরো? ওই কুকুর?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, শিরো।" বলে, বুড়ো সরল চিত্তে গলগল করে সব বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিলে পড়শিকে। সৌভাগ্যের কথা, না বলেও পারা যায় না।

"হ্যাঁ হে কাঠুরেদাদা, তা তোমার শিরোকে একটা দিন ধার দাও না দাদা আমায়।"

তার আর কী। কাঠুরিয়া— মনে যাই হোক, মুখে আর না করতে পারে না। বলে, "নেবে একদিন, তার আর কী।" বলে, কিন্তু বলতে যেন বেধে যায় কথা।

পড়শি দাঁড়িয়ে ওঠে। কিন্তু কাঠুরেনীর কিছুতে আর হাত ওঠে না কুকুরটাকে এগিয়ে দিতে। সবচেয়ে, শিরোই যেন গররাজী।

"যা বাবা শিরো, অবাধ্য হতে নেই। একটা দিন থেকে আয় গিয়ে ও বাড়িতে—" বুড়ো বলে ওঠে তখন, শুকনো গলায়।

ভারি বেআদব কুকুর তো? বলে কাউকে আর ফুরসুৎ না দিয়ে পড়শি ঝটিতি এক দড়ির ফাঁস গলিয়ে দিয়েছে শিরোর গলাতে। তারপর অনুপায় দু জোড়া চোখের সামনে দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল সে কুকুরটাকে সঙ্গে করে।

কী আর করা! ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক, দড়ির বাঁধন গলায় পরেছে, শিরোর আর না চলে উপায় কী পড়শির পেছনে পেছনে— পাড়া ছাড়িয়ে যায়, গাঁ ছাড়িয়ে যায়— বাঁশের বন, তারপর গাছের বন, নিঘাসী মাঠ, আবার বাঁশের বন— পড়শি এক-এক পা এগোয় আবার ফিরে চায়— কী রে, আর কতদূর?— আবার এগোয়— কী রে, সন্ধ্যে অবধি হাঁটাবি নাকি?

আমি হাঁটাচ্ছি? শিরো বোধহয় ভাবছে মনে মনে।

না, থেমে দাঁড়িয়েছে দেখছি কুকুরটা। মাটি শুঁকছে। থাবা আঁচড়াল, এইখানে তা হলে? ঠিক তো? কুড়ুল কাঁধ থেকে নামিয়ে, দড়ির আগাটা

টানতে টানতে চলল সে কুকুরটাকে গাছের সঙ্গে বাঁধতে—বিশ্বাস নেই, হতভাগা কুকুর না পালায়— পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দড়িটাকে ছোট্ট করে দিল যতটা পারা যায়— থাক বাঁধা, নড়াচড়া বন্ধ! তারপর, নিশ্চিন্তি হয়ে খুঁড়তে বসল মাটি।

খুঁড়ছে তো খুঁড়ছেই— তিন হাত চার হাত খুঁড়ে ফেলল, হতভাগা কুকুর! চালাকি করছে না তো! চালাকি? তা হলে আর ঘরে ফিরতে হবে না তোমার এ জন্মে. . . ভাবতে না ভাবতে কোদালের মুখে শব্দ বেজে উঠছে ঠন্ করে— এই কি? পেয়েছি— বলে উত্তেজনায় চিৎকার করে ওঠে পড়শি। এখন তোলার অপেক্ষা—

ঝুঁকে পড়ে, হাত-কাঁধ শক্ত করে, উই অতখানি নিচুর থেকে টেনে তুলেছে ভারভর্তি দশাসই কলসীখানা। এইবার! কিন্তু উপুড় দিতেই— কোথায় সোনার মোহর কোথায় ওবান-কোবান— ধড়ফড়িয়ে পড়ছে খালি ভাঙা লোহা ছেঁড়া কানি টিলের চাড়া মরা ব্যাঙ— ইশ্! ইশ্! ইশ্! রাগে— মাথায় আগুন জ্বলে উঠল তার, এগিয়ে গিয়ে ধাঁ করে শিরোর গায়েই বসিয়ে দিয়েছে কুড়ুলের এক ঘা! রক্ত ছুটল ফিনিক দিয়ে—

কিন্তু সে ঘায়ে দড়িও গেল ছিঁড়ে। আর, দৃক্‌পাত না করে অমনি ঘরের দিকে তড়িৎ-বেগে ছুটে চলল কুকুর. . .

ঘর অবধি যেতে হল না। অজানা কী আশঙ্কাতে মাঝপথেই এসে দাঁড়িয়ে আছে বুড়োবুড়ি— রক্তদরিশন শিরোকে দেখে দুজন্নারই বাক্য হরে গেল মুখ থেকে।

"হা ভগবান! এ কী! এ তোর কী হল শিরো?"— কোলে জড়িয়ে তুলল নিয়ে ঘরে। "ইশ্! এ কী রক্ত রে। কী করি এখন?"

কষ্টে যত্নে কুসুমজলে কাটা ধুয়ে ঘাসপাতার রস দিয়ে পটি জড়িয়ে দিল. . . "হা ভাগবান! কী অন্যায় করলাম রে তোর ওপরে!"

—সারা রাত জেগে বসে আছে শিয়রে— কিন্তু কিসের কী! ভোর

হবার আগেই মারা গেল অতখানি নেকড়ে বাঘের মতন তাগড়াই সাদা কুকুরটা।

বুড়োবুড়ি চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাকে নিয়ে পুঁতে দিল গিয়ে জমির একটা ধার দিয়ে। তারপর ঝুরো নরম মাটির ওপর শিরোর স্মৃতি বলে লাগিয়ে দিল এতটুকু এক য়েনোকি গাছের চারা।

ক দিনের বা কথা। গাছ হু হু বেড়ে দেখতে দেখতে যেন মেঘ ছুঁয়েছে গিয়ে। আশ্চর্য কথা! গাঁ-দেশ পার হয়ে রাজ্য জুড়ে ঢি ঢি পড়ে গেছে রাতারাতি— কী? না, জানো আশ্চর্য! শিরোর কামি ভর করেছে গাছে।

বুড়ি গাছতলা নিকিয়ে মাটি তুলে বেদী গড়ল একটুখানি। রোজ সকালে শিরোর নাম করে যা হোক কিছু-একটা খাবার রেখে যায়— চোখের আড় হলেই সে খাবার লুট হয়ে যায় পাখি আর কাঠবেড়ালিদের মধ্যে— বুড়ি এসে দেখে তার খাবার চেটেপুটে খেয়ে গিয়েছে গাছের মধ্যে শিরোর যে পরানভোমরা আত্মা— সেই কামি!

বলল গিয়ে বুড়োকে— "দেখ বাপু, ওই য়েনোকির কাঠ দিয়ে বড়োসড়ো একটা ডালা গড়ে দাও তো আমায়। ভালো করে একটু পিঠে-মোচি গড়ি, ভোগ দিয়ে আসি ঠাকুর উজিগামির থানে— শিরোর কল্যাণে!"

বুড়ির কথায় অতবড়ো গাছটা একা হাতে বুড়ো কাটতে বসল।

কেটেকুটে, নিপুণ করে গড়ল একখানা কাঠের থালা, লতাপাতা ফুলের নক্‌শা গা ভরা। তাইতে পিঠে-মোচি চুড়ো করে নিয়ে বুড়ি ফিরল দেবতাকে উচ্ছুগ্গো সেরে।

এক-আধজন জানা-চিনতি আসতে থাকে খবর পেয়ে— বুড়ি হাত পুরে পুরে পিঠে দেয় সবাইকে— লোকজন আসছেই তারপর একজন একজন— হঠাৎ খেয়াল হয় বুড়ির— আরে! এত যে দেয়া হল, এক বিন্দু কমে নি তো থালার! এটা কী করে হল?

আরো লোক আসছে— বুড়ি দিতে লাগল মুঠো মুঠো হাত ভর্তি

করে— পিঠে যে কে সেই!

শুধু কি পিঠে? সাঁঝের বেলা খেতে বসে দেখে থালা ভর্তি কত হরেক যে খাবার! দু দিন পাঁচ দিন— যখনই খেতে বসে— থালা ভর্তি ভর্তি কত পদ কত স্বাদের যে খাবার।

দেখতে দেখতে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল সে অফুরন থালার কথাও।

লোক তো আসছেই। তার উপর উঁকিঝুঁকি দিয়ে যায় সেই যে পাশের ঘরের পড়শি— ভেতরে ওঠে না। আবার আসে উঁকিঝুঁকি দিতে— সময় নেই অসময় নেই— শেষটা আর না পেরে উঠেই এল ঘরে— "হ্যাঁ গো কাঠুরেদাদা, কী চণ্ডাল রাগ! কী অন্যায় যে হয়ে গেল আমার! দিনরাত গুমরে মরছি!"

বুড়োবুড়ি নীরব হয়ে শোনে।

"সেদিন থেকে চোখে আমার নিদ্রে নেই হে কাঠুরেদাদা। উঠছি বসছি, কেবলই মনে হচ্ছে কী অন্যায়টা না হয়ে গেল আমার হাতে!"

আহা অনুতাপী মানুষটা! বুড়োবুড়ির মনটা যেন আপনা থেকেই নরম হয়ে যায়।

"যখনই মনে হয় কুকুরটার কথা. . ."

বুড়োবুড়ি নীরব হয়ে শোনে।

"তা দেবে তোমার ওই থালাটা এক সাঁঝের জন্যে?"

থালা? আমতা-আমতা করছে বুড়ো, মনে যাই থাক। মুখে আর না করতে পারে না শেষ অবধি। "তা নাও এক সাঁঝ।"

কাঠের থালাটা নিয়ে ঘরে গেল পড়শি। একবার আশপুরোনো খাওয়াটা নয় খেয়েই নেয়া যাক সকলে মিলে। ঘরের যে যেখানে সব্বাইকে ডাক দিয়ে মধ্যিখানে পাতা হল থালা। হরেক থালা রেকাবি বাটিকুটি এত এত নিয়ে বসেছে সব গোল হয়ে। চুপ! গোলমাল নয়, স্থির হয়ে বোসো দেখি সব, দেখ এবারে—

দেখে অফুরন থালার ওপর দেখ্-দেখ্ করে চুড়ো হয়ে উঠছে—

না; খাবার সামিগ্রি কিছু নয়, উপুরিউপুরি জমে উঠেছে— খালি ভাঙা লোহা ছেঁড়া কানি ঢিলের চাড়া মরা ব্যাঙ—

মুহূর্তে, রাগে আগুন চড়ে উঠল মাথায়। তবে রে? পড়ে ছিল কুড়ুলখানা— ক্রমাগত ফালা করে কুপিয়েও রাগ যায় না, শেষে কাঠের চটাগুলো হড়্‌হড়্ করে ঢেলে দিল গিয়ে জ্বলন্ত চুলোর ভেতরে।

পরদিন থালা ফিরিয়ে আনতে গিয়ে বুড়ো দেখে থমথম করছে পড়শির উঠোন-ঘর।

বেরিয়ে এল লোকটা, মুখ ভার। বুড়ো আমতা আমতা করে বলে, দেবে না কি থালাটা আমাদের?

পড়শি কথা কয় না। ভেতর থেকেআর কে বলে উঠল, "থালা ওই উনুনে, যাও তুলে নাও গে—" বুড়ো গিয়ে দেখে উনুন-ঠাসা ছাই—

"পুড়িয়ে ফেলেছ?" হাউহাউ করে কেঁদে ফেললে বুড়ো। "ওর মধ্যে ছিল যে আমাদের শিরোর পরানভোমরা— কামি—"

"পুড়িয়ে ফেললে তোমরা?"

উনুনে হাত ডুবিয়ে বুড়ো সেই ছাই তুলতে লাগল মুঠো করে করে। তোলে আর কাঁদে, পেটকোঁচড় ভর্তি ছাই নিয়েই ফিরছে শেষে— চলে এক পা এক পা, চলে আর কাঁদে— চলে, আর এক-এক মুঠো ছাই নিয়ে উড়িয়ে দেয়—

হেমন্ত শেষ হয়ে আসছে। নতুন শীতের হাওয়া দিয়েছে চার ধারে— গাছপালা মুড়োনো— এক দমকা ছাই লাগল গিয়ে ফুজি গাছের ডালে, আর থমকে গেল বুড়ো। হঠাৎ দেখে গাছটা ভরে যাচ্ছে যেন পাতায় পাতায়, যেন কুঁড়ি দিয়ে উঠল দেখতে দেখতে

কী হল? রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হলদি-লেশ-মুড়োনো সাকুরা গাছ। কৌতূহলে বুড়ো উড়িয়ে দিল একমুঠো ছাই তার ডালেপালায়, আর তখুনি

দেখতে দেখতে সারা গাছ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল গোলাপি আভার বসন্ত ফুল—

সেই পথ দিয়ে চলেছিলেন এক রাজপুরুষ দাইমিয়ো, পাশে পাশে সাঙ্গোপাঙ্গ সামুরাই সব— হঠাৎ দেখেন আলগা হাওয়া উঠছে, সে হাওয়ার ঘা লাগতেই হঠাৎ গাছ ভরে উপচে উঠেছে বিজিবিজি কুঁড়ি আর মঞ্জরী, গরবী সাকুরা ফুল—

কাছে আসতে দেখেন, দুঃখীমতন একটা বুড়োসুড়ো লোক, কী যেন বিড়বিড় করছে নিজের মনে।

"তুমি? তুমি ফুটোলে নাকি এই অকালের চেরী ফুল?"

হতভম্ব দাইমিয়ো। দেখেন, লোকটা কাঁদছে। কাঁদছে, আর বিড়বিড় করছে কী যেন নিজের মনে।

"আশ্চর্য! তুমি ফুটিয়েছ এই অকালের চেরী ফুল? আরো পারো? ওই যে ওই গাছটাতে?"

বুড়ো পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল পাশের মুড়ো গাছটার তলাতে। একমুঠো ছাই তুলে উড়িয়ে দিল আলগা হাওয়ায়। ছাই তো না, শিরোর পরান-ভোমরার আগুন-পোড়া রুপোলি রেণু— হাওয়া লেগে ছড়িয়ে পড়ল নিচু থেকে ওই উঁচু ডালপালায়, আর,—

গোলাপি আভা দেয়া মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে উপচে পড়ল, ঝলমল করে উঠল গাছটা।

দাইমিয়ো থ হয়ে দাঁড়িয়ে। কী কাণ্ড! শুনিও নি তো এমন আশ্চর্য! ফুল ফুটিয়ে দেয় মানুষে? ফুল-ফোটানো মানুষ, রাজা তো নেই এখানে, দেশের রাজার হয়ে আমাদেরই দিতে হয় তা হলে তোমার সম্মানী।

সর্, তোল্, নিয়ায়— হৈচৈ পড়ে গেল সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে। রাস্তার ওপরেই মেজ পড়ল ফটিকপাথরের। লাক্ষার নক্‌শা-কাটা থালার ওপরে পাটের চাদর, একজন তুলি নিয়ে বসে পড়েছে সিল্‌কের ওপরে মানপত্রের

ছবি লিখতে, একজন থালার ওপর ঝমঝম করে ঢেলে দিয়ে গেল অত উঁচু সোনার টাকার চুড়ো।

দাইমিয়ো নিজে এগিয়ে এসে কাঠুরের হাতদুটো চেপে ধরলেন।

খবর ছুটল বাতাস ভর করে।

আসতে-যেতে লাগল লোক আর লোক। অবাক হয়ে চায় সব আশেপাশে।

—শুনেছিস?

—শুনেছিস?

আর, খবর পেয়ে এবারেও হিংসেয় বুক ফাটতে লাগল পড়শির। এই চুলো থেকেই তো তুলে নিয়ে গেল কাঠের ছাই, আর কি না—

তাড়াতাড়ি উনুনপাড়ে গিয়ে যেটুকু পড়ে-ঝরে আছে হাতড়ে কেঁকে পেটকোঁচড়ে পুরে খানিকটা দূর উজিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে হাঁক পাড়তে লাগল আপন মনে— "ফুল ফোটাই গো— শুকনো গাছে ফুল ফোটাই গো—"

পথে পথে সেখানটাতেই আবার এসে পড়েছে সেই দাইমিয়োর দলবল— এ আবার কে?

"শুকনো গাছে ফুল ফোটাই গো—"

এ যে আবার আরেকজন দেখছি! এ তল্লাটে দেখছি একের পর এক ফুল-ফোটানোর লোক! কী কাণ্ড! জানতামই না। "কী হে, তুমিও ফুল ফোটাও নাকি?"

"হেই হুজুর, ফুল তো আমিই ফোটাই গো!"

"তবে যে আরেকজনকে দেখে এলাম একটু আগে?"

"কাকে আবার দেখলে! ও, সেই বুড়ো? ও তো আমারই চেলা।"

"তুমি গুরু? ভোজবিদ্যে তা হলে তোমার?"

"কী বলেন হুজুর," বিনয়ে জিভ কাটল পড়শি।

"বেশ। ফোটাও তবে, দেখি। ওই তো কত গাছ রয়েছে, ফোটাও!"

খুশিতে, আশাতে হড়বড় করে ছুটল সে সোজা সামনের গাছতলাতে। "দেখুন হুজুর— এই দেখুন—" ব'লে, মুঠো ভর্তি ছাই সে উড়িয়ে দিল ওপরমুখো—

ছাই ভেসে উড়তে লাগল শীতের বাতাসে. . .

আবারও ছুঁড়ল মুঠো করে— ছাই দমকা হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল সামুরাইদের মাথায় মাথায়, দাইমিয়োর মুখে চোখে

ভয় পেয়ে, যত ছিল মুঠো মুঠো ছুঁড়তে লাগল ছাই—

হাওয়াবাতাস কালচে হয়ে গেল, ছাই প'ড়ে মুখ-চোখ জ্বলতে লাগল সব্বার, ঘোড়াগুনো ভয় খেয়ে হঠাৎ‌সামনের পা তুলে দিল মাথার সমান, ঘোড়ার পিঠ থেকে খসে পড়ল দু-দুজন সামুরাই—

জাপটে ধরল উঠে পড়শিকে। আর দুজন ঘোড়া থেকে নেমে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বাঁধল— আছমোড়া-পিছমোড়া

দাইমিয়ো বললেন, "তুমিই তা হলে গুরু?"

মুখে বাক্য নেই।

পড়শির ঠাঁই হল এবারে অন্ধকার কারাঘরে।



চাঁদনী

বেণুকুমারী

বাঁশ কাটে কে রে? না গো, চোর-ডাকাত নই; রাজাদের,সদাগরদের, পাইক-লেঠেলদেরও কেউ না। বাঁশকাটা গরিব কাঠুরে। বাঁশ দিয়ে কী হবে? না, কত কী গড়ব সামিগ্রি, বেচব হাটে, তবে না জুটবে অন্ন! তারপর বাঁশের কোঁড় কুচিয়ে ভাত রাঁধবে কাঠুরেনী। দাদা, ও কাঠুরেদাদা, কী হবে অত বাঁশ দিয়ে? ছেলেমেয়ের দঙ্গল ঘিরে এসে ধরে পাড়ায় না পৌছতে, তো বুড়ো তাদের বানিয়ে দেয় ফুলের সাজি, লেখার তুলি, কঞ্চির কিরিচ, ধনুক-তীর। একজনকে বানিয়ে দিলে এতটুকু বাঁশি, তিনটে ফুটো দিয়ে তিনটে সুর বেরিয়ে পড়ছে আচমকা— মুখ চকচক করে ওঠে ছেলেটার।

"যাবি আমার সঙ্গে?" বুড়ো গিয়ে ঘেঁষটে দাঁড়ায় তার। "ধ্যুৎ," ব'লে সে পালায় ঘেঁষা ছিঁড়ে।

"চল্ না আমার ঘর!" বুড়ো গিয়ে পিঠে হাত দেয় জনে জনে। "যাব না— যাব না— বিচ্ছিরি ঘর তোমার! ভাঙা তোবড়া, ঝুল নোংরা—" খিলখিল

করে হেসে গড়িয়ে সব ছড়িয়ে হারিয়ে যায় একরাশ প্রজাপতির মতো।

এই হল বাঁশকাটা কাঠুরিয়ার গল্প। তাকেতোরি মোনোগাতারি।

একলার একানি চালা একখানা কাঠুরে-কাঠুরেনীর। গুঁড়ো-সুঁড়োও যদি থাকত একটা! ভারি কষ্ট মনে। বুড়ো বেরিয়ে যায় কুড়ুল কাঁধে সারাদিনের মনে, কাঠুরেনী ভরদুপুর বসে বসে গড়ে চুবড়ি খালুই খেলনা পুতুল। সে লোক কখন ফিরবে কে জানে। এদিকে বুড়োও ফেরে নিত্যি নতুন দিকে-অদিকে। ঠঙ্! ঠঙ্! কুড়ুল আছড়ায় প'ড়ে পুরুষ্টু বাঁশের গোড়াতে। তারপর দুপুরের তাতে অস্থির হয়ে জিরোতে বসে একটা দণ্ড, ঘাম মোছে কপালের।

একদিন অনেকটা ভেতর-বনে কাঁচা-সবুজ নতুন বাঁশের একটা ঝাড় দেখে ভারি মনে ধরে গেছে। তো মনসই একখানা বাঁশ বেছে নিয়ে তার গোড়ায় তখুনি বসিয়ে দিয়েছে কুড়ুল— এক ঘা দু ঘা— ও মা! বাঁশের কাটা ফাঁক দিয়ে সবজে আলোর একটা ফিনিক বেরিয়ে আসছে যে! তিন পা পিছিয়ে আসে কাঠুরিয়া। কী হল? খানিক বাদে ফের সাহস করে এগিয়ে পর পর ঘায়ে সে কাত করে ফেললে বাঁশখানা— গোড়ার ভেতর দিয়ে যেন স্রোত বেরিয়ে আসছে সবজে আলোর। ব্যাপার কী? ভাবতে ভাবতে শোনে আবছায়া সুরে কে গান গাইছে— কাটা ওই গোড়াটার ভেতরে নাকি? ভয় ভেঙে গোড়াটা ছুলতে ছাড়াতে লেগে গেল। শেষে দেখে গোড়ার একদম মুখটাতে সাদায়-সবজেয় মেশা যেন একটা ফুল। ফুল তো না! নজর করে দেখে এইটুকু এক মেয়ের মুখ ঢলঢল করছে দেবকন্যার মতো। আরো স্থির হয়ে দেখে রাতের সাগরের মতো চুল তার, আর তারার মতো শান্ত উজ্জ্বল চোখদুটো, আর সে যে কত ফুলের গন্ধ তার চারি দিকে— বুড়োকে দেখে অমনি তার হাতদুটো বাড়িয়ে দিল। আর যেই তাকে বুকে টেনে নিয়েছে, সব ক্লান্তি যেন শান্তি হয়ে গেল কাঠুরিয়ার।

ভগবান মিলিয়ে গিয়েছেন। মেয়েকে বুকে চেপেই দেবতার উদ্দেশে

হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ে বুড়ো সেই বনের মাঝখানে। তারপর বাঁশ কাঠ ফেলে তখুনি ছুট সোজা আপন ঘর।

"দেখ্ কী এনেছি কাঠুরেনী।"

কাঠুরেনী দাঁড়িয়েছিল দোরে। "দেখি, দেখি—" বলে সে এগিয়ে গেল, "ও মা! এ কোত্থেকে পেলে?"

"দেব্‌তা মিলিয়ে দিয়েছেন রে আমাদের। বড়ো ঝাঁপি আন, দোলনা বানিয়ে দি এখুনি।"

সে ঝাঁপিতে ফুল-রেশমের পাঁজ বিছিয়ে মেয়েকে শুইয়ে কাঠুরেনী হঠাৎ দেখে সবজে আলোয় ভরে গেছে তাদের ঘরখানা। আর সে যে কত ফুলের গন্ধ উঠছে চারি ভিতে!

বুড়ো তখন বলতে বসে তার মাটি ফোঁড়া সৌভাগ্যের বিবরণ।

এই সবে শুরু! দিনে দিনে হঠাৎ বাড়বাড়ন্তই খালি দেখছে তারপর কাঠুরে। দু পা না যেতে মিলে যায় মনসই বাঁশ, হাত না ছোঁয়াতে গড়া সামিগ্রিতে ফুটে ওঠে তারিফ কারু, নিমিষে বিকিয়ে যায় হাটে। নির্ঘাত ওই মেয়েরই পয়ে।

কী নাম দেব আমাদের মেয়ের?

আমরা কি পারি দিতে? যাই বরং আজারির কাছে।

আজারি থাকেন মন্দিরে। দেখে ভেবে তিনি বলেন, "এ যে দেবকন্যা! বড়ো ভাগ্যে এসেছে রে তোর ঘরে। পালন কর রাজকন্যের মতো, দেখিস শিক্ষে-দীক্ষে দিতে পারিস যেন সময়মতো। নাম? রাখ্ চাঁদনী।" বলে তিনি রঙে তুলি চুবিয়ে নামটা লিখে দিলেন পাটের কাপড়ে।

গড় হয়ে প্রণাম করে সাধুকে দুজনাতে। বলে, "কী বা দেব দেব্‌তাকে, হাতে গড়া এই ফুলের সাজিটা রেখে যাই। যদি লাগে দেব্‌তার পুজোয়—"

সাধু খুশি হয়ে বলেন, "দেবতা তো সদয় তোদের 'পরে! দেখিস খালি চাউর করিস নে বাইরে মেয়ের কথা।"

চাউর না করলেই কি চাপা থাকে? কাঠুরে দেখে, হঠাৎ যেন ঝিকিমিকি দিয়ে উঠছে তাদের নোংরা তোবড়া চালা, ঘেরাও বাগানের আগাছা উধাও হয়ে শাকে-সবজীতে ফুলে উঠছে দেখ্-দেখ্ করে। ম ম করছে ফুল, পাখি পতঙ্গ উড়ে আসছে নাগাড়ে।

ফের একদিন অনেকটা চলে গেছে ভেতর-বনে। ফের সেই কাঁচা-সবুজ নতুন বাঁশঝাড়— ছাঁৎ করে ওঠে বুকটা! আবার? কী ভেবে তবু বসিয়ে দিয়েছে কুড়ুলখানা সেই দণ্ডেই— ঠঙ্! ঠঙ্! এক ঘা দু ঘা— ও মা! চেরা ফাঁক দিয়ে বেরোতে লেগেছে যে হঠাৎ আরা আরা আরা আরা— টাকা টাকা টাকা নাগাড় সোনার টাকা— ডাঁই হয়ে উঠল মাটির ওপর। এ

আবার কী কাণ্ড? রইল পড়ে বাঁশ কাঠ। সঙ্গের ঝোলাটুক বোঝাই দিয়ে ছুটল তখুনি সে ঘর।

তারপর যখনই বনে ঢোকে, যখনই মনে ধরে একটা বাঁশ, কুড়ুল বসায়— এক ঘা দু ঘা, আর অমনি বাঁশ চিরে গলগল করে বেরিয়ে আসতে থাকে আরা আরা আরা আরা— টাকা, সোনার টাকা— ডাঁই হয়ে ওঠে মাটিতে। যত পারে ঝোলা বোঝাই দিয়ে খালি ঘরে ফেরা।

নতুন জামা গায়ে উঠল কাঠুরের। হার বালা গায়ে উঠল কাঠুরেনীর। একানি চালাটা তাদের বদলে বদলে একটু একটু করে হয়ে উঠল হাতা ঘেরা দেখনাই কাঠের বাড়ি একখানা। নতুন চাটাই, নতুন পর্দা ঘরে ঘরে। চার বেড় জঙলা বেড়ার চাঁচ-বেঁকারির তকতকে পাঁচিল— কানাঘুষো সোরগোল হয়ে উঠল ক্রমে ক্রমে। গাঁয়ে সবার খালি এক কথা— গুপ্তধন পেল নাকি কাঠুরে?

কারা আবার বলে, কে এক রূপুসী নাকি এসে আছে ও বাড়িতে— নাকি অপরূপ রাজকন্যে, নাকি বিদ্যেধরীরা চৌষট্টি কলা শেখাতে আসেন তাকে গভীর রাতে। বলে, কিন্তু কেউ তার মুখ দেখতে পায় নি একটা বারও।

বাইরে বেরোনোই বিড়ম্বনা হয়ে উঠল কাঠুরের। মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় লোকে, নয়তো হাত উঁচিয়ে দণ্ডবৎ করে যায়— কাঠুরে বুঝতে পারে না ঠাট্টা কিনা। আবার গায়ে-পড়া হয়েও আসে এক-একজন, "এই যে কাঠুরেদাদা, কাকে নাকি এনে লুকিয়ে রেখেছ দাদা ঘরকোণে? ধন যে তোমার উথলে উঠছে গো—" ব'লে উত্তরের দেরি না করেই মুচকি হেসে পিছু হাঁটে।

একটুও আর শান্তি থাকে না যেন কাঠুরের মনে।

ক্রমে সে বুঝতে পারে গাঁয়ে আর একটা লোকও নেই যে তাদের ঘরের মেয়ের কথা না জানে। শেষ সে কাঠুরেনীকে বলে একদিন ডাক

দিয়ে, "শোন্ কাঠুরেনী, কদিন আর আড়াল করব! মেয়েও তো বড়ো হল, দুনিয়ার হালচাল তো তারও জানা দরকার। তো এক কাজ করি, কী বল্! একটা ভোজ দি গাঁয়ের সব্বাইকে ডেকে, দেব্তার কৃপায় পয়সার তো অচ্ছল নেই আমাদের! তারপর নিজে মুখেই বলি ভেঙে সব কথা— নিজেও স্বস্তি হই, এক থাবা বালিও পড়ুক আগুনে!"

"বেশ তো, ডাকো সবাইকে।"

তাই ঠিক হল। পাকশালে ধোঁয়া উঠতে শুরু হল নাগাড়ে। ভিয়েন বসল, পিঠে-মেঠাইয়ের গন্ধ ভুর্‌ভুর্ করতে লাগল চারি পাশে, খাটিয়ে-পিটিয়ে লোকজনে সরগরম হয়ে উঠল বাড়ি। শেষে পরিপূর্ণ ভোজের বেলা কাঠুরে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে ভাঙলে তার গূঢ় কথা। গোটা বৃত্তান্তই সে বলে গেল সরল মনে। কিভাবে চাঁদনী এল তার ঘরে। কিভাবে বাঁশের গোড়া খুলে উগরে পড়ল সোনার টাকা, কিভাবে ভাগ্য ফিরল তার দিনে দিনে। কেন ফিরল হঠাৎ ভাগ্য, তারই? সে তো জানে না, কেন। কে জানে বলো দেব্তা কেন কখন হঠাৎ মুখ তুলে চান কারও পানে। তবে তোমরা হলে কিনা আমার একান্ত আপ্তজন, এক গাঁয়ে গায়ে গায়ে আছি আজ কত কাল— তোমাদের না বলে পারি? ব'লে সবার সুমুখে এবারে সে সরিয়ে দিল অন্দর ঘরের পর্দাখানা—

ঘরমুখে মুখ নুয়ে দাঁড়িয়ে যেন চাঁদের গড়া কন্যা এক— রাতের সাগরের মতো কালো চুল, তার মধ্যে পারিজাত ফুলের মতো মুখখানা, কিন্তু চোখদুটো নামানো, সে দেখছে না কাউকে।

ভোজসভাসুদ্ধু লোক অপলক হতবাক্ হয়ে দেখতে লাগল চেয়ে চেয়ে।

আর কাঠুরে যখন ফের পর্দা নামিয়ে দিয়েছে যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে উল্লাস করে উঠল সব একগলাতে। "এ যে দেবকন্যা গো! বড্ড বরাত গো তোমার কাঠুরেদাদা! তো যাক, ভালোই হয়েছে। এখন নিয়েসো ভোজ,

দেখি কী আছে, কত আছে।" দু হাতে পড়ে গোগ্রাসে খেতে লাগল লোকগুনো মহা আনন্দে। খেয়ে খেয়ে রাত পুইয়ে গেল, নড়ার শক্তি চলে গেল, তখনও খাওয়া ফুরোয় না। লোক আসাও ফুরোয় না— আশেপাশে গাঁ ভেঙে তখন আসছে সব, খবর চারিয়ে গেছে দিকে দিকে।

তিন দিন তেরাত অবিশ্রান্ত চলল ভোজের উৎসব। ক্ষান্তি হল, তবু তো বিরাম নেই লোক আসার। দূর দূর থেকে লোক ভিড়িয়ে আসছে স্রোত জলের মতো— খালি চোখের দেখা দেখে যাবে একবার রাজকন্যে চাঁদনীকে।

কিন্তু চাঁদনী সেই যে দুয়োর দিয়েছে গিয়ে, সে তো আর বেরোয় না।

যারা আসছে এত দূর থেকে তারাই বা ফেরে কী করে একবারটি না দেখে!

অনুরোধ, উপরোধ, হাতজোড় ক'রে মিনতি করে কাঠুরে। শেষে ফটকে ঝুলিয়ে দিল পেল্লায় তালা। তো লোক উঠছে পাঁচিল বেয়ে, বাগানে কানাচে দাঁড়িয়ে দেখা পেতে চায় একপলক। বাঁশের পাঁচিল ভেঙে পাষাণ পাঁচিল তুলে দিল কাঠুরে, তাও পাছভিত ভেঙে উলুক-শুলুকে দেখতে মুখিয়ে আছে সব দিনে রাতে।

তবু সবেরই তো শেষ হয়, উৎসাহেরও। ভিড় যেমন উপচে পড়েছিল, ভাঁটার টানও লাগল তেমনি ধীরে ধীরে। শেষে দিনান্তে মাসান্তে এক-আধজন নাছোড় কৌতূহলী ছাড়া কেউ আর আসে না। বললে বোঝালে তারা চলেও যায়। বছর ঘোরার মুখে শেষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ফের কাঠুরিয়া।

ফেলল তো, কিন্তু কতদিন! ফের একদিন শোনে ফটকের বাইরে ঘোড়া অসি জোশ সোর উঠছে, ঝমাঝম বাজছে ফটকের অত বড়ো তালা— কাঠুরে বাইরে বেরিয়ে দেখে, ও বাবা! কী সব বীরপুরুষ রাজপুরুষ ছেলে! কী তাদের জরীমুক্তোর বেশবাস! কী সব ঘোড়া! কাঠুরে যেতেই বিনয়ে

মাথা নুয়ে বলে তারা পাঁচ বন্ধু পাঁচজনে— দু ভাই রাজপুত্র, এক মন্ত্রীপুত্র, এক সেনাপতিপুত্র আর এক বিচারাধীপের পুত্র— এতদিন তারা কেবল শুনেইছে, আজ এসেছে একত্র হয়ে, স্বচক্ষে দেখে যাবে রাজকন্যা চাঁদনীকে।

কিন্তু চাঁদনী যে বেরোয় না কারও সামনে।

সে তারা শুনছে না। এই তাঁবু গাড়ল ফটকগোড়ায়। এখন জল হোক ঝড় হোক ভূকম্প বরফপাত হোক, চাঁদনীকে না দেখে তারা নড়ছে না।

বুড়ো কাতর হয়ে বলে, সে ঘরোয়া মেয়ে, দেখার কিছু নেই তাকে— তোমরা কত বড়ো বীরপুত্র রাজপুত্র— সারা দেশের মান্য, তোমরা ফিরে যাও বাবা।

কে বা শোনে সে কথা। চাঁদনীকে না দেখে ফিরব না আমরা দাদা, স্থির করেই এসেছি। বলে তারা গ্যাঁট হয়ে ভুঁয়ের ওপরেই ব'সে কেউ গো খেলার চৌকি পাতলে, কেউ ফুঁ দিলে বাঁশিতে।

কী করা। বুড়ো তখন চাঁদনীকেই বোঝাতে পড়ে গিয়ে অন্দর ঘরে, "শোন্ মা, তুই তো জানিস দেবতা মিলিয়ে দিয়েছিলেন তোকে, বাঁশমূলে জন্ম তোর! কী বা গুণ, কী বা সাধ্যি আমাদের, তবু এ ঘরেই তো এত বড়োটা হলি তুই। আজারি নিজের থাকতে বিদ্যেবতী সাধুনীদের পাঠিয়ে কত কলা শেখালেন পড়ালেন, আমরা ছাই সে সব বুঝিও না। আর দেখ্, এখন আমাদেরও বয়েস হল, কদ্দিন আর আয়ু বল্। এখন একটা সুপাত্রের হাতে তোকে তুলে দিয়ে যেতে পারলে নিশ্চিন্দি মরতে পারি মা—"

চাঁদনী কুঁকড়ে যায় শুনতে শুনতে। "না না বাবা, আমি যাব না।"

"শোন্ মা, ঠাণ্ডা হয়ে শোন্— বুড়ো বলে, পাঁচটি ছেলে এয়েছে বাইরে— যে সে নয়, রাজপুত্র বীরপুত্র সব না জানি কোথাকার, তুই একবার চল্। একবারটি দাঁড়া গিয়ে ঘরমুখে—"

চাঁদনী দিশেহারা হয়ে বলে, "না না বাবা, আমি যাব না।"

একেবারেই মুষড়ে পড়ে কাঠুরিয়া।

তখন বাবাকে অমন কাতর দেখে চাঁদনী বলে, "বেশ বাবা তোমায় অমান্য করব না— এই আমি লিখে দি কটা কথা এই কাপড়ের ওপরে— বলে সে তুলি চুবিয়ে লিখতে বসলে এক ফালি পাট-কাপড়ে নিপুণ করে, তারপর বাবাকে বলে কী লিখল সে। বলে, বলো গিয়ে বাবা। এই একটা জিনিস আমি চাই, যদি এনে দিতে পারে তো যে প্রথম আনবে তাকে আমি ডেকে নেব নিজে থেকে—" ব'লে কাপড়খানা পাকিয়ে গুটিয়ে দিলে কাঠুরের হাতে।

এদিকে বাইরে পাঁচ বন্ধুতে তখন জমাটি হয়ে বসে গো খেলা খেলছে, বাঁশি বাজাচ্ছে, পদ্য বাঁধছে চাঁদনীর নাম বসিয়ে— বুড়োকে দেখে ত্রস্ত হয়ে উঠে এল। "কী হল দাদামশাই। আসবে চাঁদনী? যাব আমরা তার কাছে?"

"চাঁদনীই ডেকে নেবে তোমাদের, বাবা। কিন্তু সে যে একটা শর্ত করে পাঠিয়েছে—"

"কী শর্ত?" কথায় মাঝখানেই চিৎকার করে ওঠে পাঁচজন।

কী না, যে তাকে এনে দিতে পারবে তার একটা ইচ্ছের সামিগ্রি, আপনি সে ডেকে নেবে তাকে।

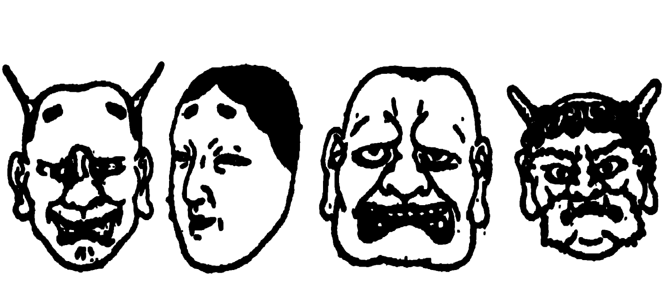
"সে আমরা আকাশ পাতাল দুনিয়ার প্রান্তে থাকলেও তো নিয়াসব", পাঁচজনই বলে ওঠে একগলাতে।

চাঁদনীর সে পাকানো লেখা-কাপড়খানা খুলে দিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তারা। পাঁচজনের জন্যে পর পর পাঁচটা কড়ার গোট-গোট করে লেখা। এক নম্বর : রাজপুত্র কুরুমামোচি, তিনি যদি হোরাই পাহাড়ের সোনার গাছে ফলা দুধপাথরের ফল একটা আমায় এনে দেন। দুই : রাজপুত্র ঈশিৎসুকুরি, তিনি যদি এনে দেন ভগবান বুদ্ধের পরিব্রজ্যার কালে তাঁর নিয়ে ঘোরা সেই জলপানের পাথরবাটিটি। তিন : সেনাপতিপুত্র ওতোমো-নো-মিয়ুকি, তিনি যদি হোরাই পাহাড়ের মহানাগের গলার যে পঞ্চরত্নের

মুঠ, সেটি এনে দেন আমায়, চার : বিচারাধীপের পুত্র ইসো-নো-কামিমারো, হোরাই পাহাড়ের দোয়েলের পেটের কড়িটি যদি এনে দেন দয়া করে। আর পাঁচ নম্বর : আবে-নো-মিউস মন্ত্রীপুত্র, তিনি কেবল আনুন চীনপাহাড়ের সেই গেছো ইঁদুর— বিপদের আঁচ পেলেই সুন্‌সান্‌ হয়ে যায়— তার ছালখানা, আগুনে ঢেলে দিলেও যে ছাল পোড়ে না।

সব শোনার পরে মুখ খুললেন মন্ত্রীপুত্র : "চাঁদনী রাজকন্যার ইচ্ছে কিছু কঠিন বলেই মনে হচ্ছে।"

যেমনই ফুটছিল সব উৎসাহে তেমনি চুপসে গেছে হঠাৎ পাঁচজনাতেই। ইসো-নো-কামিমারো বললেন কেবল নিচু গলায়: "রাজকন্যা কিভাবে ভাবছেন তাঁর এমন অসম্ভব সব চাওয়া এনে দিতে পারবে কেউ!" নিঃশব্দ নিস্তেজ একে একে ঘোড়ায় চাপল গিয়ে পাঁচজনাতে, মন্থর কদমে ঘোড়া চলে গেল ফেরা পথে।



রাজপুরী ফিরে সোজা নিজের মহলে গিয়ে ঢুকলেন রাজপুত্র কুরুমামোচি। মুখ থমথম করছে, দাসদাসীও আসতে ভয় পায় কাছেপিঠে। দেয়ালে স্বর্গপাহাড় ফুজির হালকা ভাঁজ পড়া একখানা ছবি। রাজপুত্র ভাবছেন ফুজি পাহাড় তো নয়, এ হল হোরাই পাহাড়— সবাই জানে সে পাহাড়ের কথা, কিন্তু সে যে ঠিক কোথায়, কেউ জানে? সোনার গাছ সেখানে, তার দুধপাথরের ফল— সেও কি সত্যি? আছে আদপে? ভাবতে ভাবতেই খানিকটা স্বস্তি বোধ হয়— তা হলে একটা চেষ্টা করেই দেখা যাক না কেন! চেষ্টার কথা ভাবতে ফের হাসি ফুটে ওঠে মুখে। তালি বাজিয়ে ডাকলেন তখন রক্ষীদের। এখুনি খোঁজ পাঠাও যাও, রাজ্যে কে কোথায় আছে দুঃসাহসী যুবা, দক্ষ কারিগর। উচিত মজুরি মিলবে, বাছাই হবে যে রাজপুত্রের হোরাই পাহাড় অভিযানের সঙ্গী।

হোরাই পাহাড়ে যাবেন রাজপুত্র? তা যান। দেশে দুঃসাহসী যুবা তো কম নয়, দক্ষ কারিগরেরও কমি নেই! তার ওপরে অত প্রাপ্তি। কাজেই দল বাছাইয়ে বেশ দুটো-চারটে দিন লেগেই গেল। তারপর সুদিনে সুক্ষণে রক্ষী-পরিচর মাল্লা আর নতুন অভিযানের লোকেদের নিয়ে রাজপুত্র গিয়ে উঠলেন সদ্য রঙ সাজ দেয়া তাঁর মধুকর জাহাজে। চেনা জলের উপর ভাসতে ভাসতে হঠাৎ একদিন সে গিয়ে পড়ল অজানা সাগরে। সেই অজানায় যেতে যেতে পাহাড়দ্বীপও ভেসে ওঠে একদিন। রাজপুত্র হাঁক দিয়ে বলেন, ওই দ্বীপে জাহাজ লাগবে।

কাছ হয়ে দেখা যায় সে রীতিমতো জঙ্গলপাহাড়। আরো কাছ হতে চোখে পড়ে বিশাল বালিয়াড়ি পাহাড়ের পা অবধি। জাহাজ লাগল। মস্ত কটা তাঁবু পড়ল বালির পাড়ে। তখন রাজপুত্র বললেন আসল কাজের কথা।

"শোনো সব, এখানে বসে গড়বে তোমরা হোরাই পাহাড়ের সেই

সোনার গাছের পাতা ভর্তি একটা ডাল। দুধপাথরের নিটোল ফল ঝুলছে ডালে। এমনিভাবে গড়বে যেন মনে হয় সদ্য ভেঙে আনা সে সোনার ডাল। ধাতুর রেশ না থাকে। মনে রেখো এইটি পেলে পরে তবে চাঁদনী রাজকন্যা আমাদের দেশে আসবেন রাজবধূ হয়ে। যাও, খাও-দাও, তারপর কাজে লাগো। যতক্ষণ না শেষ হয়, না ঠিক হয় কাজ, ছুটি নেই। আর মনে রেখো, কথা কখনও প্রকাশ না হয় ঘুণাক্ষরে।"

রাজপুত্র ফিরে গেলেন আপন শিবিরে। আর অসি ঝঞ্ঝনা দিয়ে তাদের ঘিরে পড়ল রক্ষীদল। অভিযানদলের লোকেরা স্পষ্ট বুঝল এবারে, কী তাদের কাজ।

যজ্ঞ শুরু হয়ে গেল পাহাড়তলিতে। কত যে উনুন আর ধোঁয়া, কত ডালের পাতার ফুলের নমুনা,কত ধাতুর তাল, কত মিশোলের কিমিয়া, আর কত যে রুদ্ধশ্বাস নিপুণতা— দিনের পর রাত, রাতের পর দিন ঘুরে ঘুরে, থামা নেই জিরেন নেই খিদে নেই তেষ্টা নেই। ক্ষণে ক্ষণে সাবধান, রক্ষীদের ভুরকুটি— লোকগুনো দড়ির মতো পাকিয়ে গেল, মুখ ভর্তি ভাঁজ, হাতে ঠেলে ওঠে শিরা— রাজপুত্র এসে কাজ দেখে যান মাঝে মাঝে, "নাঃ কিচ্ছু হয় নি। ভাঙো, ফের গড়ো।" ভাঙতে ভাঙতে গড়তে গড়তে অবশেষে যেন মনে ধরার মতো মনে হয় জিনিসটা। সোনার জলুস দেয়া তাজা ডাল আর পাতার ভেতরে পরিপূর্ণ দুধপাথরের ফলটি, স্বচ্ছ সাদা ফলের মুখে একটু গোলাপির আভা— হাতে ছুঁলে ঠাণ্ডা আরাম লাগতে থাকে। বুকটাতে ধরে রাখেন কিছুক্ষণ। এদ্দিনের পরে যেন খুশি লাগছে আজ। রাজপুত্র রক্ষীদের সরিয়ে দিলেন। মনসুখে হুকুম দিলেন ফুর্তি মোচ্ছবের। ছাড়া পেয়ে হুটোপুটি করে পড়ল সব কূলের সাগরে। তাদের খেলা সাঁতার আর মাছ ধরার আহ্লাদে জল তোলপাড় হয়ে উঠল।

এবারে নিশ্চিন্দি ফেরা পথ। বেগে চলেছে জাহাজ। তবু রাজপুত্রের অধৈর্য লাগতে থাকে। আরো দেরি? আরো কত দেরি? যত দেরিই হোক,

জাহাজ পৌঁছল শেষ অবধি দেশের ঘাটে। পৌঁছল তো, তাও এত দেরি কেন সিঁড়ি ফেলতে! এত দেরি কেন নাবার যোগাড় করতে! তারপরেও অশান্তি— পথ, ঘোড়া সব ঠিক আছে তো?

হাঁকডাক করতে-করতেই মস্ত লাক্ষার পেটি নিজে কাঁধে বয়ে নীচে নামলেন রাজপুত্র। লোকজন রক্ষী-পাইক ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসেছে। না, ঘরে ফেরা নয়, ওই ধুলোপায়েই সোজা একদম চাঁদনী রাজকন্যা বরাবরে। এগিয়ে উঠতে যাবেন ঘোড়ায়, দিক করে উঠেছে পেছনের লোকগুনো— রাজপুত্র, মজুরি আমাদের, মজুরি—

কে চায় মজুরি? ভুরকুটি করে পেছন ফিরলেন— একটা লোক এগিয়ে এসেছে ভিড় ছেড়ে। ইশারায় ডাকলেন রাজপুত্র সামনের রক্ষীকে— মজুরি মিটিয়ে দাও। লোকটার বুক এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল মুহূর্তে রক্ষীর কিরীচে।

তারপরে কী হল দেখতে রাজপুত্র আর সেখানে নেই ততক্ষণে। ঘনিষ্ঠ জনেদের নিয়ে তিনি তখন দড়বড়ি ঘোড়া ছুটিয়েছেন চাঁদনী রাজকন্যার গাঁ মুখো।

সে গাঁয়ে পৌঁছে, ফটকগোড়ায় ঘোড়া থেকে নেমে, তখন আর তর সয় না এক মুহূর্ত। ঘা দিচ্ছেন দুয়োর তালা ঝনঝনিয়ে, হাঁকডাক লাগিয়ে দিয়েছেন— অস্থির হয়ে বুড়ো এসে দোর খুলতে দেরি। "এই যে কাঠুরেদাদা, রাজকন্যেকে ডাকো— কোথায় তিনি?"

"পেয়েছ নাকি তুমি? সত্যি?"

"পেয়েছি মানে?" দেখতে দেখতে দুজনে নামিয়ে এনেছে লাক্ষার পেটি— "নাও, আছে এর ভেতরে।"

আহ্লাদে ভরে উঠল মুখখানা বুড়োর, "দাও দেখি!" বলে সে নিজেই বয়ে নিয়ে চলল বাক্শোখানা চাঁদনীর ঘরে। "চাঁদনী— চাঁদনী—" বাইরে থেকেই ডাকতে থাকে, "রাজপুত্র ফিরেছেন চাঁদনী।"

"সত্যি?" চাঁদনী দাঁড়িয়েছে দোর খুলে।

"এই দেখ্—" ব'লে বাক্‌শোর ডালাটা খুলে ধরে কাঠুরিয়া।

আর দুজনারই চোখ যেন ঝলসে যায় ডালপাতা-ফলের চমক লেগে। অপূর্ব! উচ্ছ্বাস করে ওঠে চাঁদনী। হাতে ছুঁয়ে ঘুরিয়ে দেখে, আর বলে, অপূর্ব! দেখতে থাকে হাতে তুলে এক দিকে, উলটো দিকে— দেখতে দেখতে মুখ হঠাৎ থমকে উঠল কেন? তারই ভেতরে অধীর হয়ে ঘরে ঢুকে এসেছেন রাজপুত্র কুরুমামোচি। "কী হল রাজকন্যা! হল পছন্দ?"

রাজকন্যা তখনও হাতে ধরে চেয়ে আছেন ডালসুদ্ধু ফলটার দিকে, মুখ যে গম্ভীর সে আর রাজপুত্রের চোখে পড়ে না। তিনি বলতে শুরু করে দিয়েছেন তখন ভীষণ অভিযানের বিবরণ। "কী বলব কাঠুরেদাদা, ভগবানের কৃপা আর রাজকুমারীর পয়। নইলে ফেরা কি হত ইহজীবনে? কোথায় সলিল সমাধি হয়ে সাগরের মেঝেয় পড়ে থাকতাম না মাছ আর হাঙরের খাদ্য হয়ে? সেদিনের সে তুফানের কথা মনে হলে এখনও কাঁপুনি লাগে। শোনো বলি। কতদিন কেবল জল আর জলে দিশেহারা হয়ে উঠেছি, এক রাতে হঠাৎ তপ্ত ঘোলাটে লেপায় একআকাশ তারা মুছে দিয়ে হঠাৎ সমুদ্র তোলপাড় করে দলবাঁধা রাক্ষস দানোর মতো হুড়পাড় করে এল বিপুল কালো তুফান— সে যে কী ঝড় আর কী বর্ষা— অকূল দরিয়ায় উন্মাদের মতো ছুটছে জাহাজ, তার ওপর দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে তোড়ে— প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি শতখানা হয়ে খুলে যায় চার ধার দিয়ে, মাল্লারা উলুটিপালুটি খেয়ে কে কোথায় হারিয়ে খুঁটো-কাঠ আঁকড়ে দাঁড়িয়ে কে জানে! কখন যে আমারও চেতনা চলে গেছে, খেয়াল নেই। জ্ঞান হতে দেখি রোদ খেলছে। না, জাহাজ ভাঙে নি। এক পাহাড়দ্বীপের কূলে শান্ত জলের উপরে শুয়ে আছে কাত হয়ে। আমরাও মরি নি, কূলে শুয়ে আছি এধারে-ওধারে ছড়িয়ে।

"সেখানেই পাড়ের গাছপালা ভেঙে দুটো চালা বেঁধে আছি। ফিরব

যে, হদিশ করতে পারি নে যে এসে পড়েছি কোথায়। পাহাড় বেয়ে দ্বীপের ভেতরে ঢুকি খাবারের যোগাড় দেখতে। জায়গাটা চিনতেও বটে। একদিন পায়ে পায়ে চলে গেছি— হ্যাঁ, অনেকটাই চলে গেছি। হঠাৎ মনে হয় বসত আছে কোথাও কাছে। পরমাসুন্দরী এক বনবালা মেয়ে কলস কাঁখে চলেছেন জল ভরে। সামনে গিয়ে বলি, একটু জল দাও মা। তেষ্টা লেগেছে বড়ো। তো তিনি কলস হেলিয়ে ধরলেন। অঞ্জলি পেতে কলসের ভেতর চেয়ে দেখি জলের নীচে ঝলমল করছে সোনা। জিগ্যেস করি, এ কোন্ দেশ মা। তো তিনি বললেন—

"যা বললেন তাতে কানদুটোকেও প্রত্যয় হয় না। সত্যি? এই নাকি হোরাই পাহাড়? এই সে দেশ? এদ্দিনের কষ্ট সত্যি তা হলে শেষ হল? নিজের ইচ্ছেয় কি পৌঁছতে পারতুম কোনাদিনও।

"পরদিন উষাভোরে বেরিয়ে পড়লুম চুড়োয় উঠব মন করে। ব্যাস্! সেই যে বেরিয়েছি, উঠছিই তারপর। দশ দিন দশ রাত উঠলুম ক্রমাগত, এগারো দিনের দিন বেলা পুইয়ে এমন একটা জায়গায় গিয়ে উঠেছি যেখানে মনে হয় আকাশের ভেতরে উঠে গেছি একদম। আর নীচের জমিন যেন সাতাশ রঙের ফুলের ফরাস বিছানো। মেঘ আর পাখির দল উড়ে চলেছে গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে— যে মুখো চলেছে সেদিকে চেয়ে দেখি রুপোর হারের মতো এক নদী। সাঁকো পাতা ওপর দিয়ে, আর নদীর ওপারে— ঠিক সোজাসুজি ওপারটাতে এক ঝুপুসী সোনার গাছে ধরে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ দুধপাথরের ফল. . .

"এই তো সে গাছ! ছাঁৎ করে ওঠে বুকের মধ্যেটা। তারপরই মনে হয় হাওয়াবেগে উড়ে যাই এখুনি। ডাল-ফল সবসুদ্ধু নিয়ে হাওয়াবেগে উড়ে যাই ফের, চাঁদনী রাজকন্যার কাছে— অপেক্ষা করে আছেন রাজকন্যা। চলব, তার আগেই কালো রাতের বিশাল মিশমাড় একখানা পর্দা পড়ে গেল মুখের ওপরে। এত কালো দেখি নি কখনও। বড়ো বড়ো তারা ছুটোছুটি

করছে তার মধ্যে শান্ত ঠাণ্ডা আগুন ছড়িয়ে। দিশা লেগে যায় যেন।

"সারারাত একঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানটাতেই। তারপর ভোরের প্রথম পাখি ডাকল। ফিকে ধরল আকাশে। সেই আবছায়ার ভেতরে নদী জেগে উঠেছে আর দেখি ওপারের সে গাছ সর্বাঙ্গে সোনার আগুন ধরিয়ে জ্বলছে।

"কিভাবে নদী পেরোলুম, গাছতলায় দাঁড়িয়ে নাগাল ধরলুম ফলসুদ্ধু ডালের, সে আর হুঁশ নেই। ডালটা ভাঙতেই সারা চরাচর ব্যেপে বেজে উঠল বাজনা। সে আওয়াজও কখনও শুনি নি।

তারপর কখন নেমেছি এসে সাগরের কূলে, দলে মিলে, জাহাজ সারাই করে ফের মাসের পর মাস জল ভেঙে আজই পৌঁছলুম এসে দেশে। কিভাবে যে সব সারা হল শেষ অবধি! মনে হয় যেন মুহূর্তেই ঘটে গেল পুরো কাণ্ডখানা। পৌঁছে আর তো তর সয় না—"

রাজপুত্র সবে শেষ করেছেন এই পর্যন্ত, বাইরের একটা প্রবল সোরগোল হঠাৎ বাধা দিয়ে পড়ল মাঝখানে। আবার কে এল বাইরে! কাঠুরিয়া ব্যস্ত হয়ে উঠল, "যাই দেখে আসি—"

বাইরে বেরিয়ে দেখে মেলা লোক চেঁচাচ্ছে, দেখা করতে চাই রাজকুমারীর সঙ্গে—

বুড়ো বুঝিয়ে বলে, "কী তোমাদের বলবার, বলো আমায়। আমি জানিয়ে আসছি গিয়ে ভেতরে। লোকগুনো তেড়িয়া নয় তেমন। তারা চিঠি লিখলে বসে একখানা—"

ভেতরে চিঠি নিয়ে ঢুকে দেখে, সত্যি তর সইছে না আর রাজপুত্র কুরুমামোচির। সে উদ্ভ্রান্তের মতো কেবলই বলছে, "আর কিসের দেরি রাজকন্যা। আমি রাজপুরী সাজাতে বলে এসেছি। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চতুর্দোলা। লোকজন সব ফুল-নিশান নিয়ে চেয়ে আছে নগরের মুখে। শুধু সোনার ডালটি নাও, আর থাক সব পড়ে— এখন চলো—"

চাঁদনী বলে, "দেখি কী লিখেছে চিঠি?"

কুরুমামোমোচি গিয়ে হাত ধরলে বুড়োর, "রাখো চিঠি তোমার—"

রাজকন্যা বলে, "অত তাড়া কিসের রাজকুমার। শুনুন না কী লিখেছে—আপনারই তো অভিযানদলের সব লোক।"—রাজকন্যা পড়তে শুরু করে দিলে, কিভাবে লোক ভর্তি হল রাজপুত্রের অভিযানদলে, কিভাবে গড়া হল হোরাই পাহাড়ের সোনার ডাল, কিভাবে মজুরি পেল লোকেরা ফেরার পর, কিভাবে—

রাজকন্যা থেমেছে একটা দণ্ড, কুরুমামোচি লাথির ঘায়ে ছিটকে ফেললেন সোনার ডালখানা, তারপর দাপিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে—ফটক আছড়ে খোলার, ঘোড়া ছোটাবার আওয়াজ ভেসে এল। ফিরেও চাইলেন না বাইরের লোকগুনোর দিকে।



জাল ইঁদুরের ছাল

রাজপুত্র কুরুমামোচি যখন পাহাড়দ্বীপে শিবির খাটিয়ে দলবল নিয়ে সোনার ডাল গড়তে ব্যস্ত, মন্ত্রীপুত্র আবে-না মিউশি তখন মাথা টাটাচ্ছেন কিভাবে জাদু ইঁদুরের ছাল ছুলে আনা যায় সহজ কোনো উপায়ে। দু-চার দিনেই মাথা খুলে গেল। হাতের গোড়াতেই তো রয়েছে বন্ধু, ভোজবিদ্যের রাজা ওকিয়ো। ওকিয়ো সামাকে একখানা চিঠি লিখে খামের ভেতরে ভরে দিলেন মেলা টাকা, লিখলেন উপযুক্ত ইঁদুরছালের জন্যে দরকার হলে আরো কিছু খরচাপাতিও করা যাবে।

পত্রপাঠ ওকিয়ো নিজে এসে হাজির। সে বলে, "এমন ইঁদুর সত্যি আছে কিনা জানি না, তবে চাঁদনী রাজকন্যা যখন বলেছেন, আগে একটা খোঁজ লাগানো দরকার। না পাই তখন দেখা যাবে কিসে কী করা যায়।"

"বেশ, লাগাও খোঁজ।"

ওকিয়ো লোক লাগিয়ে দিলেন দূরে কাছে নানা প্রান্তে।

এক বছর কাটল। পর বছর কাটল উৎকণ্ঠায়। তৃতীয় পুরো বছর ক্রুদ্ধ হয়ে কাটালেন মন্ত্রীপুত্র। ওকিয়োর সাড়া নেই। মন্ত্রীপুত্র আরেকখানা চিঠি পাঠালেন তীব্র ভাষাতে লিখে। তারও উত্তর এল না। নিশ্চয় টাকাকড়ি সব উড়িয়ে এখন গা ঢাকা দিয়ে আছে কোথাও। তবে আমাকে ফাঁকি দেয়া সোজা নয়, ওকিয়োর অজানাও তা নয়— অস্থির হয়ে দ্বিতীয় চেষ্টার উপক্রম করছেন এমন সময় ওকিয়োর চিঠি এল। সে লিখেছে, দেশের বিদেশের প্রত্যেকটা কানাচ প্রান্ত সন্ধান করে অবশেষে হোরাইয়ের পাহাড়চুড়োর সাধুর কাছ খোঁজ পেয়েছে সে ছালখানা। সে গিয়ে ধরে পড়েছে, কিন্তু সাধু চান পুরো মন্দিরখানা সংস্কার করে দিলে পরে সে ছাল তিনি হাতছাড়া করবেন। অদ্দূর উঁচু দেশে মজুর মশলা নিয়ে গিয়ে মেরামতি, সে কি সোজা খরচ? এখন মন্ত্রীপুত্র যা ভলো বোঝেন।

মন্ত্রীপুত্র কী আর ভালো বুঝবেন। টাকাটা তিনি চিঠি যে এনেছিল তার হাতেই পাঠিয়ে দিলেন ওকিয়োর কাছে। আর অল্পদিনেই ওকিয়ো এসে হাজির হল। ছাল পাওয়া গেছে। কাঠের বাক্‌শোর ডালা খুলে গুটোনো ইঁদুরছালখানা মেলে ধরতে চোখ ফেরানো যায় না যেন। রুপালি নীলের গায়ে রোমাঞ্চ রোঁয়া দিয়ে উঠছে হাওয়া লেগে— সত্যি চোখ ফেরানো যায় না।

কী বলে মান্যি দি এখন বন্ধু ওকিয়ো সামাকে? আচ্ছা, ফিরে আসি আগে চাঁদনী রাজকন্যের বাড়ি থেকে। উপযুক্ত মান তুমি পাবে বন্ধু। বলে ঘোড়া সাজিয়ে পালকি বেহারা সাথে করে তুরিৎ রওনা হয়ে গেলেন মন্ত্রীপুত্র।

তারপর?

তারপর সেই ডঙ্কা পড়ল ফের ফটকগোড়ায়। বেরিয়ে এল কাঠুরিয়া, জমকালো কাঠের বাক্‌শোখানা ভেট গেল রাজকন্যার সকাশে। ডাক পড়ল মন্ত্রীপুত্রের—

চাঁদনী বলছে, "চমৎকার। ভারি সুন্দর জিনিসটা মন্ত্রীপুত্র। কিন্তু শুনেছিলাম যে বিপদের আঁচ পেলেই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে এ ইঁদুর।"

"পারেই তো!"

"তবে মরল কিসে?"

উচিত কথাটা যেন যোগায় না মন্ত্রীপুত্রের মুখে।

"আর শুনেছিলাম যে, আগুনে পোড়ে না এ ছাল—"

মন্ত্রীপুত্র তখন বলেন, "আপনি অকারণ ভাবছেন রাজকুমারী। এ সেই সত্যিকার হোরাই পাহাড়ের জাদু ইঁদুরেরই ছাল। এ কি মেলানো সোজা? দাঁড়ান, আগুন জ্বেলে দেখাই।"

বুড়ো নিজে গিয়ে কাঠ জ্বেলে আগুন করল তখন বাগানে। চাঁদনী গিয়ে দাঁড়াল দোরমুখে। আগুন যখন উঁচু হয়ে উঠল, আবে-নো-মিউশি

গিয়ে ছালখানা ঢেলে দিলেন আগুনে। আর মুহূর্তে জীবন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল সে ছালের রোমাঞ্চ রোঁয়া ওঠা রামধনুর রঙ— আশ্চর্য!

আশ্চর্য সুন্দর! মন্ত্রীপুত্র নিজেই চেঁচিয়ে ওঠেন উচ্ছ্বাসে।

কিন্তু কথা শেষ হয় নি, তার আগেই সে ছাল ঝলসে কুঁকড়ে কালো হয়ে একটা চিমসে দড়ির মতো পাকিয়ে ছিটকে এল পায়ের কাছে। নিমিষে ফ্যাকাসে হয়ে গেল আবে-নো-মিউশির মুখখানা।

মৃদু হেসে চাঁদনী ঢুকল তার অন্দর-ঘরে। তার পেছনে দোর বন্ধ হয়ে গেল।



সেনাপতিপুত্র ওতোমা-নো-মিয়ুকি কী করছিলেন এতখানি সময়? রাজা-মন্ত্রীর ছেলে নয়, তবু তাঁদের কাছের জন, তার উপরে অস্ত্রবিদ্যায় মহারথী। চাঁদনীর কি অপছন্দ হবে তাঁকে? তাঁর ঘরদোর?

দিবারাত্র ভাবছেন তিনি কিভাবে তা হলে পঞ্চরত্নের মুঠটি খুলে নেবেন গলা থেকে! তারও আগে প্রশ্ন, মহানাগের দেখা পাবেন কিভাবে। দুর্গম হোরাই পাহাড়। সেখানে গিয়ে পৌঁছনোই কি সোজা?

রক্ষী-সঙ্গীদের নিয়ে মন্ত্রণায় বসলেন ওতোমো। "কাউকে জানো, গেছে হোরাই পাহাড়ে? দেখা পেয়েছে সেখানে মহানাগের?"

মুখ-চাওয়াচায়ি করে এ ওর। সত্যি কি কেউ জানে তারা এমন লোকের হদিশ?

তাদের নিরুত্তর দেখে ওতোমো তখন বলেন, "যাক তোমরাই নিজেরা তবে যাও খোঁজ ক'রে। কে না জানে এদেশে হোরাই পাহাড়ের উদ্দেশ। ঠিক না জানুক, অনুমানে জানে। শোনো, সেই হোরাই পাহাড়ে অকুতো হয়ে চ'রে বেড়ায় এক মহানাগ, তার গলায় বাঁধা পঞ্চরত্নের এতখানি মুঠ একখানা। সেটি আমার চাই। তোমরাই জানো কিভাবে আনবে।"

"টাকাকড়ি যা লাগে, ভাবনা নেই। যদি আনতে পারো, ফিরে এলে পাবে দশদুনো।" বলে উঠে গেলেন সেনাপতিপুত্র এতগুনো লোককে ধন্দে ফেলে।

দশদুনো তো পাবে। কিন্তু বস্তুটি মিলবে কোন্ উপায়ে? শুনেছে তো তারাও। মায়া নাগ, তার রত্ন মুঠ ছোঁয়া দূর, কোনো মানুষ কখনও যেতেই পারে নি তার কাছে। তা হলে কী করা? একজন বলে, "কী আর করা! এসো বসে একটা বুদ্ধি খাটানো যাক। এতগুনো টাকাই কি ছাড়া সোজা? বলো?"

সোজা যে নয় সে আর বলতে! অতএব আগাম যা মিলেছিল নেয় ভাগাভাগি করে। স্থির হয় পরেও ভাগ করে নেবে যা পাবে।

চলে গেল তারা। আর ওতোমো স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, চাঁদনী আপনিই ছুটে এসেছে তাঁর বাড়ি। তাঁর বীরত্বের গাথা গান গেয়ে বেড়াচ্ছে চারণ-কোমুসোরা, তাই শুনে। আমার ও বাড়ি মনে ধরবে আপনার রাজকন্যা? ওতোমার হঠাৎ মনে হল বাড়িখানা একটু বাড়ানো সাজানো দরকার। ডাক পড়ল সেরা বাড়ি-বানানো কারিগরদের।

দেখতে দেখতে এক দুই করে তিন বছর গড়িয়ে গেল ওতোমোরও। তিন-তিনটে আস্ত বছর। কারও ফেরার নাম নেই। যা পাওয়া গেছে সেই বেশ— ভেবে কি সব ফেরার হয়ে গেল একেবারে? দূর হোক গে ছাই! ওতোমা স্থির করলেন, আর কারও অপেক্ষা নয়, তিনি নিজেই বেরোবেন। ভেবে হাওয়াবেগ একখানা জাহাজ গড়ার বরাত দিলেন। যোগাড় করলেন সাত সাগরের পোড়খাওয়া বিশারদ একদল মাল্লা। রসদ ভরাই হল জাহাজে। একেবারে জাহাজ ছাড়ার মুখো যখন গন্তব্যের কথা ভাঙছেন ধীরে ধীরে, একজোটে নারাজ হয়ে পড়ল লোকজন। ওতোমো তখন একবার বলেন, ফেরার পরে তাদের কত প্রাপ্তি হবে, আর- একবার বিভীষণ একটা অস্ত্রের মহড়া মেলে দেন তাদের ঘিরে। শুধু তো মাল্লারা নয়, জঙ্গী একটা রক্ষীদলও চলেছে সঙ্গে। লোভে ভয়ে যাতেই হোক, তারা উঠে জাহাজ ছাড়ল অগত্যা।

সুপবন আর শান্ত জলের মাঝ দিয়ে গেল কটা দিন, তারপর কিয়ুশুর দূর দক্ষিণের সীমা ছাড়াতেই হঠাৎ উঠল ঝড়। সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। দিন না পেরোতে একাকার কালি হয়ে উঠল জল আর আকাশ, আর জাহাজ যেন হালকা একটা ডেকচির মতো উড়ে ভেসে চলল ঘুরপাক খেতে খেতে—

মাল্লারা প্রথম যুঝতে চেষ্টা করল। যখন নিজেরাও উলুটিপালুটি খাচ্ছে— দুঃসাধ্য বাঁচার চেষ্টা— চীৎকার করে শাপমন্যি শুরু করে দিল ওতোমোকেই। "মহানাগের হার চাই ওঁর। আহ্লাদে বাঁচি না। বাঁশ-ঘুরোনো আনাড়ি লেঠেল, সে যায় কিনা দেবনাগের হার কেড়ে আনতে— কত ক্ষ্যাম্‌তা! এতগুনো লোককে যে যন্জালি, তার? আবার পাইক দেখিয়ে

ভয় খাওয়ানো! ওরে তোর পাইকরাই যে ভির্মি পড়ে আছে, দেখ গিয়ে!"

ওতোমো নিজেও মাস্তুলের খুঁটো আঁকড়ে অঝোর বর্ষায় ভিজছেন আর ঝড়ের দমকায় কাঁপছেন। তাঁর মুখে কথা নেই।

তখন লোকগুনো বলছে, "ওরে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষ্যামা চা ভগবানের কাছে। অতি লোভ ভালো নয়।" তো ওতোমা তাই করেন। চীৎকার করে প্রার্থনার মন্ত্র পড়তে থাকেন হাঁটু গেড়ে বসে। জলঝড়ের আওয়াজের ভেতরে তাঁর চিৎকার হারিয়ে যায়।

লোকগুনো দেখেন তাঁকে আক্রোশে ঘিরে আসছে গোল হয়ে। প্রাণপণ উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করনে। কোথাও আরেকটা আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন— প্রবল তুফান দমকায় কে যে কোথায় ছিটকে গেল আচমকা সে আর তিনি জানেন না।

জ্ঞান হাতে চেয়ে দেখেন শুয়ে আছেন বালিয়াড়ির ওপরে। ঠিক মুখের ওপরটাতে একফালি চাঁদ— শান্ত নরম রাতের আবহাওয়া। উঠে বসে দেখেন কুয়াশা আর পাইনবনের ফাঁকে দূরে একখানা নেড়া পাহাড়— হোরাই পাহাড়? চমক লেগে যায়! তখুনি তপ্ত বাতাসে একটা ঘূর্ণি পাকিয়ে উঠল হঠাৎ চুড়ো বেয়ে— গায়ে এসে লাগে যেন ছ্যাঁকা দিয়ে পড়ে— ঘা দিল, অমনি ফেঁসে গেল আড়াআড়ি জাহাজের পাল— হঠাৎ কালো একটা ছায়া পড়েছে মনে হয় পুবের পাহাড়ে—

যে মাল্লাদের জড়াজড়ি মরে আছে বোধ হচ্ছিল, তারা হঠাৎ লাফিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে— "জয় ভগবান মহানাগ!"

"জয় ভগবান মহানাগ!" ওতোমোর দিকে চেয়ে বলে, "দেখছেন কী তাকিয়ে! ক্ষ্যামা চান ভগবানের কাছে, পাপচিন্তার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসে যান। গড় হয়ে পেন্নাম করুন দেবতাকে।"

ওতোমো-নো-মিয়ুকি যন্ত্রচালিতের মতো গড় হয়ে প্রণাম করতে বসেন মহানাগের উদ্দেশে। তারপর বলেন, "ক্ষমা করো ভগবান পাপচিন্তা করেছি

বলে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়ে দাও ঠাকুর!"

আর তার প্রণাম না প্রার্থনা, কিসের জোরে কে জানে, আকাশ শান্ত হয়ে উঠল আচম্বিত। মনে হল জাহাজ ভাঙে নি বিকল হয় নি। ফাঁসা পাল পুরে উঠেছে মন্ত্রবলে। আর তাদের জাহাজ চলেছে খুশিস্রোতে। ভগবান মহানাগ প্রার্থনা শুনেছেন, ওতোমো ভাবে মনে মনে।

অনেক দিন পেরিয়ে ফের শেষে মনে হয় যেন চেনা জল, চেনা দিক্‌রেখা— বিশাল কূল একখানা এসে পড়ল দেখতে দেখতে— কাছাকাছি আসতে চোখে পড়ে জাহাজঘাটা— নোঙের নামিয়ে তক্তা ফেলে এক সাথে পাড়ে নামতে ছুটোপুটি করে সব্বাই— কোন্ দেশ, চিনতে পারো?

চেনাই লাগে। পাড়ে নেমে ঘুরে-ফিরে দেখে আসে সব খানিকটা— আকাসি— আকাসি— হঠাৎ আনন্দে চেঁচাতে লেগেছে— ওই তো সোনার বালি বাঁধা পাড়! ওই তো পাইনের পাহাড়চৌতারা উঠে গেছে দিগন্তে! ওই তো আমাদের সূর্য ওঠার দেশ হি নো মোতো—

চিৎকার শুনে ওতোমাও নেমে এসেছেন পাড়ে। হ্যাঁ, এই তো আমাদের নীল কুয়াশা ঘেরা চেনা-চেনা দেশ! ওই তো চেনা পাহাড়, চেনা পথঘাট। এখন একটা ঘোড়া, নয় তো পালকি চাই কেবল শহরে ফেরার।

খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল হাওয়ামুখে। সেই যারা টাকা-মোহর নিয়ে পঞ্চরত্নের মুঠ আনতে গিয়েছিল তারা এসে ভিড় করে আছে ওতোমার ফেরা পথে। সবাই একযোগে হা-হুতাশ করে ওঠে— কী দুর্দৈব! আমরা তো আগেই নাকাল হয়ে এসেছি, লজ্জায় মুখ দেখতে পারি নে। স্বয়ং মিয়ুকি— দেবতা হাচিমন যাঁকে রক্ষা করছেন— তাঁরও কি না এই দশা! হায় হায় হায়।

ওতোমা কথা না বলে রক্ষী দিয়ে সরিয়ে দিলেন লোকগুনোকে। তারপর সব আগে ঘর থেকে বের করে আনলেন কুডুল একখানা। নতুন বাড়ানো-সাজানো বাড়িটা কুপোতে শুরু করলেন দু হাতে, উন্মাদের মতো, যতক্ষণ না অমন কারু-করা ঘর চ্যালা কাঠ হয়ে স্তূপ হয়ে ওঠে চোখের ওপরে।

রাজপুত্র ঈশিৎসুকুরির কাছে চাঁদনী চেয়েছিল ভগবান বুদ্ধের পরিব্রজ্যার কালের জলপানের পাথরবাটিটুকু। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ তো জাপানে আসেন নি কখনও! রাজপুত্রের মনে হল কোনো পুঁথিতে যেন তিনি পড়েছেন ভগবানের সে পাথরবাটি রাখা আছে ভারতের কোনো শাক্য গুম্ফায়। কিন্তু ভারত— সে কি এখানে? কত দুষ্পার গিরি নদী কান্তার পেরিয়ে, কত অগম্য পথ কত বিপদ পাথার— সাধুরা যেতেন বটে এক কালে ধর্মধন আনবার মানসে জীবন তুচ্ছ করে, কিন্তু সে কি আর সাধ্য আজকের দিনে? রাজপুত্র একখানা চিঠি লিখে পাঠালেন রাজকুমারীকে :

রাজকুমারী, আপনার ইচ্ছে মান্য করে আজ আমি রওনা হলুম পুণ্যভূমি ভারতের পথে। না জানি কত পথ কত ঢেউ তুফান কত গিরি খাদ কত হিংস্র বিপদ মুখে করে চলতে হবে কত দিন। আপনার ইচ্ছার জোরেই নিশ্চয় পৌঁছব একদিন সে দেশে। আপনার ইচ্ছার জোরেই ফিরব অভীষ্ট সিদ্ধি করে। আশা করি ফিরে আপনার দেখা পাব। ইতি দেবতাদের প্রিয় রাজপুত্র সিদ্ধিব্রত ঈশিৎসুকুরি।
পুনশ্চ। এ পত্র যখন আপনার হাতে গিয়ে পৌঁছবে, ততদিনে অনেক পথ আমি পেরিয়ে গেছি, জানবেন।

চিঠি পাঠালেন তিনি বিশ্বাসী অনুচরের হাতে। আর পাঠিয়ে পরক্ষণেই বসল তাঁর মন্ত্রণাসভা। জরুরি দায়িত্বের ভার দেব, শোনো, দেশের সর্বত্র প্রান্তে যত শাক্য মন্দির আছে তার ভাণ্ডারে প্রাচীন জলপানের পাত্র যত পাও অবিলম্বে নিয়েসো সংগ্রহ করে। কে জানে কত পুরোনো সাধু, হয়তো ভগবান অমিদ বুদ্ধই জলপান করেছেন সে বাটি থেকে। একটি মন্দিরও বাদ না যায়। একটি পুরোনো পাত্রও পড়ে না থাকে।

সবাই আছে যে যার কাজে-কর্মে জড়িয়ে, অমনি একটা হঠাৎ আজ্ঞাতে কারোরই খুশি হবার নয়। কিন্তু স্বয়ং রাজপুত্রের আদেশ। দিকে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার আগে তারা নিজেদের মধ্যে ছোটো একটা শলাও করে নিলে, বলা বাহুল্য।

তাদের ফিরতে ঘুরে গেল একটা, দুটো, পুরো তিনটে বছর, তারপর ফিরতে শুরু করেছে ফের সব একে একে।

আর রাজপুত্র ভাবছেন, এতগুনি বাটির মধ্যে একটিও কি পাব না যা দেখে মনে হয় ভগবান জল খেয়েছিলেন ওই পাত্র থেকে?

কিন্তু যত লোক ফেরে, যত বাটি এনে স্তূপ করে তোলে, রাজপুত্রের বুকটা ততই দমে যেতে থাকে। এ যে সব হালফিল শৌখিন বাটি— বেলে পাথরের, জেডপাথরের, হয়তো দোকানেই মেলে। হাত ঠেলা দিয়ে ছত্রখান করে ফেললেন রাজপুত্র। ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে ছড়িয়ে যায় যত বাটি বাঁধানো চবুতরা ছাপিয়ে। ক্রোধে দপ্‌দপ্ করতে থাকে তাঁর রগদুটো।

একজন দাঁড়িয়েছিল সারির পেছনে। অদেখ্‌তা সে বেরিয়ে গেছে রাস্তার কোণে ফেলে আসা হত-পুরোনো তার বাটিটা আনতে, বুঝতে পারে নি অত অত দেখনাই বাটি কেন রাজপুত্রের মনে ধরে না। ফিরে জামার হাতায় ঢাকা আধভাঙা বাটিটা সে তুলে ধ'রে বলে, "মহামান্য রাজকুমার। এই সে বাটি, নিন।"

রাজপুত্র বাটি হাতে নিয়ে সপ্রশ্ন চেয়েছেন, সে তখন বলে, "রাজপুত্র, ঘুরে ঘুরে মন্দিরে মন্দিরে সাধুসঙ্গ করি দিনের পর দিন। একদিন এক সাধু বলেন, ভারতভূমির বুদ্ধস্মৃতির সব ধন জমা পড়ে আছে হোরাই পাহাড়ের শাক্য মন্দিরে। সেখানে দেখতে পারো একবার।

"সেখানে যাওয়া তো সোজা নয় রাজকুমার! কিন্তু সংকল্পের জোর থাকে তো ঠেকাবে কে? ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে জীবন ফুরোবার মুখে সত্যিই গিয়ে পৌঁছলুম। দেখি সে মন্দিরে থাকেন এক অতি প্রাচীন সন্ন্যাসী। তাঁর

বয়সের গাছ-পাথর সেই। গিয়ে পড়লুম পায়ে। জীবনে সাধ ছিল একবার এ মন্দির দর্শন করে যাব। তা আজ পূর্ণ হল সাধ। এখন কটা দিন আশ্রয় চাই মহারাজ, ফিরব তার আর শক্তি নেই। মন্দির চাতালের একটা কোণে পড়ে থাকব, দিনান্তে একটা দানা প্রেসাদ পেলেই আমার চলে যাবে।

"কৃপা হল সাধুর।

"তারপর পিছু পিছু ঘুরি তাঁর। পুজোর যোগাড় দি। ফাইফরমাশ খাটি, সেবা করি বিশ্রামের বেলা— তো সাধু বললেন একদিন, কী মনে করে এয়েছিস এখানে, বল তো সত্যি করে?

"অন্তর্যামী সাধু, তিনি তো আপনিই জানতে পারেন সব। তবু বললুম মুখ ফুটে।

"সাধু বলেন. বলিস কী? এত বড়ো তোর পুণ্য, তুই কি না চাস ভগবানের জলপানের বাটি?

"বললুম, না পেলে এ মন্দিরেই হত্যে দিয়ে মারব ঠাকুর।

"নিবি তো রাখবি কোথায়?

"তখন বলি আপনার কথা। রাজপুত্র মন্দির প্রতিষ্ঠে করবেন, জলপানের ওই বাটিটির উপরে পুজো হবে মণিঘরে।

"তা অন্তরের কামনা কখনও তো পূর্ণ হয়। একদিন সাধু নিজে থেকেই দিলেন আমায় ডেকে, বললেন খালি, দেবতার সামিগ্রি, দেখিস অশুচি না হয়! সাধু আমার মাথায় তাঁর হাতটি ছুঁয়ে রাখলেন খালি, তারপর কী যে হল কোথ্‌দিয়ে। সাত মাসের পথ যেন চলে এলাম পলক না পড়তে—"

মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন রাজপুত্র ঈশিৎসুকুরি, রক্ষীকে ডেকে বললেন, "খুশি করে বিদেয় দাও লোকটিকে।" আর নিজে, আর দেরি নয়, তখুনি, সেই দণ্ডে বাটিটি সোনার রেশমে মুড়ে, সোনার মঞ্জুষায় ভরে, ঘোড়া সাজিয়ে, দুজন-চার জন সঙ্গী-পরিচর নিয়ে সোজা ছুটলেন চাঁদনী রাজকন্যার গ্রামপুরী।

গিয়ে দাঁড়াবার অপেক্ষা। বলেন, "ভগবান আপনি দয়া করে মিলিয়ে দিয়েছেন রাজকন্যার ইচ্ছে। ভাবতে কি পেরেছিলাম, পাব কখনও? এই নিন সে জলপানের বাটিটি।" মঞ্জুষা খুলে, সাত ভাঁজ সোনার রেশম সরিয়ে বের করলেন বাটি। এগিয়ে ধরেছেন— বাটি থেকে উড়ে উঠল রুক্ষু ধুলো আর ছাই এক পাঁজ— দমকা দিয়ে পড়ল চাঁদনীর গায়ে মুখে।

এ কী?

রাজপুত্র রাজকন্যা দুজনেই একগলাতে আর্তনাদ করে ওঠেন, "এ কী?"

চাঁদনী বলছে, "বুদ্ধ ভগবানের বাটি উগরে উঠছে নোংরা ধুলো আর ছাই? আলোর বদলে? শান্তির বদলে?"

রাজপুত্র মিনতি করে বলছেন, "বিশ্বাস করুন রাজকন্যা—"

আবারও বলেন, "বিশ্বাস করুন রাজকন্যা, এ সেই বাটি—"

নীরবে, অধোমুখে, উঠে গেল চাঁদনী কালবিলম্ব না করে, তার পেছনে দোর বন্ধ হয়ে গেল।

রাজপুত্র বসে রইলেন স্তব্ধ হয়ে।

বুড়ো কাঠুরিয়া বলে, "রাজপুত্র আপনার সঙ্গীরা অপেক্ষা করে আছে বাইরে।"

রাজপুত্র উঠে যান— উঠোন বাগান পেরিয়ে, ফটক পেরিয়ে, সঙ্গী দের দিকে না চেয়ে সোজা লাফ দিয়ে ওঠেন ঘোড়ায়। সঙ্গীরা যে লুকিয়ে হাসছে পেছনে, তাঁর নজরে পড়ে না।

এখন বলি বিচারাধীপের ছেলের কথা। সে কী করছিল এতদিন? ইসো-নো-কামিমারো?

চার বন্ধুর তুলনাতে তার অবস্থাটা কিঞ্চিৎ অন্যধারা। আপনার ভাবাটা আপনিই সে ভাবে সচরাচর। আর আপনার কাজটুকু নিজেই চেষ্টা করে ক'রে উঠতে! কিন্তু এ কাজ তো আর একলার সাধ্যি নয়! রাজকুমারী চেয়েছেন হোরাই পাহাড়ের বুলবুলের পেটের কড়ি, আবার সে পাখির গায়েও হাত দেয়া চলবে না। কী কাণ্ড! তবে সে কড়ি বেরোবে কী করে।

অনুগতদের ডেকে মন্ত্রণা বসিয়ে তিনি বলেন, "খবর আনতে পারো হোরাই পাহাড়ের বুলবুল ডিম পাড়ে কোন্ সময়ে?"

এ ওর মুখের দিকে চায় । এ আবার কী প্রশ্ন!

একজন শুধু জিজ্ঞেস করে সোজাসুজি, "জানতে পারি, পাখির ডিম পাড়ার খোঁজ কী কারণে?"

কামিমারো বলেন, "সে তোমার না জানলেও চলবে। তোমায় আনতে হবে কেবল পাখির পেটের মধ্যের কড়িটা। পাখিটাকে না মেরে। বুঝেছ?"

সে চুপ হয়ে বসে আছে দেখে বলেন, "অসম্ভব কথা বলছি না হে। পাখি যখন ডিম পাড়ে, তখুনি তার পেটের মধ্যের কড়িটা বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে ওটি তুলে নিতে হবে। পাখির গায়েও হাত দিতে হবে না, তাকে সাবধান হবারও সুযোগ দিতে হবে না। এবারে বুঝেছ?"

সে মাথা নাড়ে। বুঝেছে।

"তবে আর কী! এবারে যাও। খোঁজ করো সে পাখি ডিম পাড়ে কখন।"

কিন্তু সে কি করে জানবে। কবে সে ডিম পাড়বে!

"এখানে বসেই জানতে চাও? জানতে যেতেই তো বলছি তোমাকে।"

এক বুড়ো বসেছিল মন্ত্রণা দলে। সে যখন দেখে ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠছে, মুখ খোলে সে। "হোরাই পাহাড়ের মন্দিরের মাথায় শুনেছি অনেক বুলবুল গিয়ে বাসা বাঁধে। কোন্ বুলবুলটিকে জানব তার পেটের ভেতর আছে কড়ি? সেটা বেরোবে মুখ দিয়ে ডিম পাড়ার কালে? তবে শুনুন ধর্মাবতার! ছেলেবেলা থেকে আমিও শুনেছি এই বুলবুলের কাহিনী। সে গিয়ে বাসা বাঁধে মন্দিরের সব্বার ওপর-চুড়োতে। তাকে খুঁজে পাওয়া এমন শক্ত নয়। আমরা বরং সেখানে গিয়ে একটা বড়োসড়ো মাচান বাঁধি মন্দিরচুড়োর বরাবর, আর একটা মই বাঁধি মাচানে উঠতে। তারপর গিয়ে বসে নজর রাখি পাখিদের গতিবিধি।"

তারিফ করতে হয় বটে লোকটার কথা শুনে। "এই তো বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছ! তা হলে তোমাকেই ভার দি কাজটুকু উদ্ধার করার। পছন্দমতো সঙ্গী বেছে নাও তুমি। কাঠ, বাঁশ, দড়ি রসদ যা লাগে, টাকাকড়ি যা প্রয়োজন হয়, নাও। নিয়ে রওনা হবার যোগাড় দাও। ভেবো না, আমিও যাচ্ছি সঙ্গে। কার্যোদ্ধার যদি হয়, তা হলে তোমারও— তোমার সাত কুলে, সাত পুরুষেও আর খেটে খেতে হবে না।"

জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে অচিরেই রওনা হয়ে গেল দলটা।

পৌঁছলও শেষ অবধি অনেক বেয়ে চেয়ে— হোরাই পাহাড়, পাহাড়চুড়ো, মাঝ-মন্দিরের পাশাপাশি। তারপর গাঁইতি-শাবল কোদাল- কুড়ুলের ঠঙাঠঙ্, ভুঁই খোড়া বাঁশ কাটা রশি পাকানোর চিল্লামিল্লি চলল কদিন— দেখতে দেখতে মন্দিরের চুড়োসই মাচান বাঁধা হল একখানা, বাঁশের একখানা রাবুণে সিঁড়ি পড়ল মাচানে ওঠার— তারপর লোকগুনো খালি ওঠে আর নাবে, এটা তোলে ওটা নাবায়, কিছুতে আর পাকা হয় না ব্যবস্থা। কামিমারোকে গিয়ে বলে, "আপনি বরং উঠে এসে দেখেন একবার, নয়তো আপনিই বসেন গিয়ে ওই মাঝখানটাতে— গদি তাকিয়া সব তুলে দি।"

কামিমারো তো উঠলেন গিয়ে, কিন্তু মুশকিল হল কী— মন্দিরের

চৌধারি পুরো ঢাল ভর্তি অত যে খোপ-খোপ পাখির বাসা, সে বাসা ফাঁকা করে মাথার ওপরে হৈচৈ করে চক্কর দিতে লেগেছে তখন পাখিগুনো— এদিকে সেদিকে উঁচু উঁচু গাছের ডালে বসে জুলজুল করে দেখছে অদ্ভুত গুচ্ছের না-জানি-কী জীবের রগড়— কিচিমিচি করছে— কে জানে হাসি-মস্করা কিনা। পাখিদের হাসি-মস্করা তো আর বোঝা যায় না! কামিমারো রিরক্ত হয়ে উঠলেন। "এইভাবে এমনি লাফাঝাঁপা করলে কোনো পাখি কি আদপে ফিরবে ফের বাসাতে? এসব কাজ করতে হয় নীরবে, নিঃসাড়ে— তো কতকগুনো হুমদো হনুমানকে লাগিয়েছে কাজে!" ব'লে ঝাল ঝাড়লেন সে বুড়োর ওপর। বুড়ো বলে, "সব নেবে এসো নীচে। চলে যেতে হবে এখান থেকে।"

চলে যেতে হবে? এতখানি করবার পর?

"হ্যাঁ, যাতে পাখিরা ভাবে সব চলে গেছে উৎপাত। জায়গাটা ঠাণ্ডা হলে তখন ওরা খোপে ফিরবে নিশ্চিন্দি হয়ে। তারপর রাত বেশ ঘোর হলে পরে ঠিক দুটি লোকে আসবে এক্কেবারে ছায়ার মতো। একজন নিঃশব্দে উঠবে মাচানে। উঠে লম্বা একখানা দড়ি— মন্দিরচুড়োর যে লোহার দাঁড়াটি, সেই দাঁড়াটি পেঁচিয়ে ছুঁড়ে দেবে ফাঁসের মতো— দড়ির আগা গিয়ে দাঁড়া পেঁচিয়ে পড়বে ওই ধার দিয়ে। ওধারে সেই আগাতে বেঁধে দেব বাঁশের ঝোড়া, তার মধ্যে লতায়পাতায় আড়াল হয়ে বসবে একজন— সময় হলে মাচানের থেকে দড়ির গোড়া ধরে টান দেবে পয়লা লোক, আর উঠতে থাকবে ঝোড়া— উঠতে উঠতে থামবে এসে এক্কেবারে মন্দিরচুড়োর মুখোমুখি, ঠিক জায়গাটাতে। আর সেখান থেকে ঝোড়ার ভেতরের লোক ডালপাতায় গা মিলিয়ে নজর রাখবে চুড়োর একদম মাথার খোপের পাখিটাকে— যতক্ষণ না সে পাড়ে ডিম, উগরোয় কড়ি, ততক্ষণ।"

জুৎসই পরিকল্পনা, সন্দেহ নেই। কিন্তু, কামিমারো বলেন, "দুটি লোককে যে পাঠাবে, সে দুটি লোক কে? লোক জুটিয়েছ তো সব হোঁদল

গোপালের মতো— থামলে মনে হয় ঝিলিক পাড়ছে, চললে মনে হয় ভূমিকম্প হচ্ছে।"

যে যাই হোক, ওরই মধ্যে থেকে দুটি লোক বাছাই হল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তারা শুধোয়, "বুঝব কিসে কখন ডিম পাড়বে পাখি?"

সত্যি কথা। পাখিবিদ্যেয় জ্ঞানগম্যি বলতে তো কারোরই নেই। কামিমারো স্বয়ং পড়ালেখা লোক হলেও শহরপুরীর বাসুন্দে। পাখি পুষেছেন ঠিক, কিন্তু তার বেশি খোঁজ নেন নি কিসে কী হয়। সে বুড়োই তখন বলে, লক্ষ্য রাখবে পাখি কখন লেজ তোলে, আর লেজ তুলে আপন বাসাটি চক্কর দেয় সাত বার করে— ঠিক সাত বার ঘোরা পূর্ণ হলেই বুঝবে এইবার ডিম পাড়ার সময়।

সব বুঝে-পড়ে ঘোর রাতে দুজনে ছায়া হয়ে চলল মন্দিরে। দড়ির আগা লম্বা হয়ে ছুঁয়ে পড়ল ওধারে মাটি, তখন দড়ির সে মুখটাতে পেল্লায় একটা ডালপাতা ঠাস দেয়া ঝোড়া বেঁধে দিল অন্য লোকটা। তারপর নিঃসাড়ায় বসল ঢুকে তার ভেতর।

সময় যেতে লাগল চুল চুল করে। আরো কালো হয়ে উঠল হাওয়াবাতাস। তারার ফোঁটাগুনি জ্বলুনি দিতে লাগল তিনগুণ, ঝাঁঝাঁ করতে লাগল রাত। ঘুমন্ত পাখি কিচিমিচি করে উঠল এক-একটা খোপে। কামিমারো আর গোটা দলটা আড়াল হয়ে এসে দাঁড়িয়ে আশেপাশে— আর তারপর একসময় টান পড়ল হঠাৎ দড়িতে। এধারে টানছে লোকটা আর ঝোড়া উঠছে ওধারে— উঠতে উঠতে পৌঁছল গিয়ে ঠিক জায়গায়।

নীচের লোক ঘাড় টাটিয়ে দেখছে ওপরমুখো।

আর সে ঝোড়ার লোকটা চোখ জ্বেলে দেখছে মন্দিরচুড়োর সব চাইতে উঁচুর খোপটা। চেয়েই আছে— হঠাৎ শোনে খোপের ভেতরে ডানা ঝাপটানির আওয়াজ— বুকটা বেজে ওঠে তার— ওই বুঝি! খোপের ভেতরটা আবছায়া— কিন্তু ওই তো স্পষ্ট দেখা যায়। লেজ তুলেছে পাখি—

ওই বেরিয়ে এল— লেজের পালক ঝাপটাচ্ছে— একবার দু বার তারপর ঘন ঘন, দ্রুত— উত্তেজনায় পরের নির্দেশ আর মনে নেই তার তখন; দ্রুত সে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে খোপের ভেতরে— আর আচমকা উটকো উপদ্রবে পাখি ওড়া দিয়েছে মুহূর্তে খোপ ছেড়ে— কে জানে ঢুকে গেল কোন্ অন্ধকারের মধ্যে— লোকটা তখন অধীর হয়ে হাতড়াচ্ছে খোপের ভেতরে— কিন্তু কিছুই নেই সেখানে— না ডিম, না কড়ি— এত সে নিশ্চয় হয়ে ছিল যে নিঃশেষে মুষড়ে পড়ল এক মুহূর্তে।

টের পায় নীচে থেকে কামিমারো আর গোটা দলটা চাপা গলায় চেঁচাচ্ছে ফিসফিস করে— "পেলে? পেলে?"

দড়ি আলগা দিতে তরতরিয়ে ঝোড়া নেমে এল নীচে। লোকটা বেরিয়ে এল চুপ্‌সে, চাইতেই পারে না চোখ তুলে। বুঝতে আর কারও বাকি থাকে না যে সে পায় নি ছাই কিচ্ছু। কামিমারো গলায় আগুন ঢেলে বলেন, "অপদার্থ!"

দলের দিকে চেয়ে বলেন তারপর, "এখান থেকে পষ্ট দেখা যায় পাখি লেজ তুলছে বেরিয়ে এসে, আর উনি? মহা আনন্দে দিলেন তাকে উড়িয়ে। হাঁদা, ভুতুম, অপদার্থ কোথাকার!" ঝাল মেটে মনের? বুড়োর দিকে চেয়ে বলেন, "কোত্থেকে জুটিয়েছ এটিকে!"

"না, ঢের হয়েছে। এখানে বসে পাত পেড়ে গেলো বসে বসে। আমি নিজেই যাব।"

বুড়ো বলে, "আর একটাবার দেখা যাক না ধর্মাবতার। পাখি, বিশ্বাস, ডিম এখনও পাড়ে নি। আপনি বসুন একটু স্থির হয়ে।" মুখে বলতে পারে না, কামিমারোর থলথলে চেহারাটাও এ কাজে খুব একটা উপযুক্ত ভাবা যায় না।

কিন্তু ততক্ষণে কামিমারো তাঁর ঢোল্লাই কিমোনো খুলে চাপ জামা পরে ঢুকে বসেছেন ঝোড়ার ভেতরে, "নাও; তোলো এবারে—" বলে হাঁক দিয়ে উঠেছেন যদ্দুর সম্ভব চাপা গলায়। বুড়ো থামাতে যায়, কিন্তু সাহসে কুলোয় না।

উঠল ঝোড়া রয়ে সয়ে, থিতুও হল গিয়ে ঠিক জায়গাটাতে— চুড়োর ঠিক মুখোমুখি, কামিমারো রুদ্ধ শ্বাসে চেয়ে আছেন কখন ফেরে পাখি, আর নীচেও সব ঊর্ধ্বমুখে দম চেপে দাঁড়িয়ে। বেশ কতক্ষণ পর আবার ডানা ঠাপানির শব্দ— পাখি ফিরছে, ফিরছে— বুকটা জলদ হয়ে উঠল কামিমারোর— পাখি এসে ঢুকল তার খোপে। চুপ একটুখানি— যেন মস্ত পহর একটা, তারপর হঠাৎ চী চী করে তীক্ষ্ণ একটা ডাক দিয়ে উঠে পাখি লেজ তুলে ঝাপট দিতে শুরু করল বেগে—

চোখ দুটো ঠিকরে উঠছে কামিমারোর।

বেরিয়ে এসে লেজ তুলে ঘুরতে লেগেছে পাখি এক পাক দু পাক তিন পাক আবার আবার— ঢুকে গেল ফের খোপে— তারপর অন্ধকারেও দেখা যায় বুকে ভর দিয়ে বসে পড়ল ডানা ছড়িয়ে— উত্তেজনায় কাঁপুনি লেগে গেছে কামিমারোর— ঝোড়া নড়ছে ঢক্‌ঢক্ করে— তো সে আর চুপ থাকতে পারলে না, ডালপাতার ফাঁক দিয়ে মুখ হাত বের করে ফেলছে সোজা পাখির সামনে—

আর চী চী চী চী করে বুঝি পরম বিরক্তিতে— আবার তীক্ষ্ণ ডাক দিয়ে উঠল পাখি— যেন বলতে চায়, এ কোন্ আপদ! এ কোন্ আপদ!

ততক্ষণে কামিমারো হাত ঢুকিয়ে দিয়েছেন খোপের ভেতরে— ছড়ানো কুটোকাঠির খোঁচা, তার ওপরে গরম নরম গোল পানা কী একটা তাঁর হাতে ঠেকল— এই তো! পেয়েছি! পেয়েছি!—বলে মনে মনে উত্তেজনার ছটফটিয়ে সে জিনিস মুঠোয় বদ্ধ করে চেঁচিয়ে উঠেছেন, "নামাও— নামিয়ে নাও—"

চীৎকারে হঠাৎ বে-রাশ নীচের লোকটা দড়ি ছেড়ে দিয়েছে চমক খেয়ে, আর কামিমারো নীচে নামতে লাগলেন যেমন পড়ে ইঁটপাথর, তীর যেমন ছোটে, তেমনি— মন্দিরের ধার কাণাতে ঘষটে ঘষটে দড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে হঠাৎ সম্পূর্ণ ছিঁড়ে গেল পটাং করে— আ আ আ আ— বলে একটা তীব্র চিৎকার— তারপর নিমিষে, নীচের লোকটা কিছু ভেবে ওঠার

আগেই ঝুড়ি থেকে ছিটকে কামিমারো পড়লেন।

না, পাষাণচাতাল নয়, পাশে ছিল বর্ষার জলে ভরা পেল্লায় এক জালা, তার ভেতর। জালার জল যেন সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ল চারি ধারে, আর মানুষটা ডুবে গেল সম্পূর্ণ, ছুটে ঘিরে আসা লোকগুনো একটু বাদে দেখে দুটো হাত জেগে উঠছে জালার মুখে, মুঠো বদ্ধ একটা হাতে—

তুলল সবাই মিলে টেনেটুনে। শুইয়ে দিল চাতালে— সেবা পরিচর্যা করে কোনোমতে চেতিয়ে তুলল, কামিমারো ক্ষীণ কণ্ঠে বলছেন তারপর একসময়, "পেয়েছি কড়ি।"

"পেয়েছেন?"

মুঠো খুললেন কামিমারো। উদ্‌গ্রীব হয়ে জালার মুখে ঝুঁকে পড়েছে প্রত্যেকটা লোক—

হা কপাল! প্রত্যেকটা লোক নিশ্বাস ফেলে পিছিয়ে আসে একসাথে।

কামিমারো কাত হয়ে পড়ে দেখেন, এতটুকু একটা ফলের আকারের এক দানা গোবর। হ্যাঁ? দেহ ছেড়ে দেয় পরম দুঃখে, গড়িয়ে পড়েন তিনি চিত হয়ে। চোখে আর দৃষ্টি নেই তাঁর।

আর লোকগুনো? হোঁদল গোপালের মতো সেই লোকগুনো? তাদের কথা আর বোলো না। এমনি বদরসিক, মুখ টিপে হাসতে সরে আড়াল হয়ে যায় তারা অন্ধকারে।

কামিমারো উঠে বসতে চেষ্টা করেন কাত হয়ে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে চিতিয়ে পড়েন বারবার। মাজা ভেঙে গেছে তাঁর। সেবা যত্নে শুইয়ে নিয়ে ফিরল তারা কামিমারোকে নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে।

ঘরে ফিরে বচ্ছরভোর অন্তরীণ হয়ে রইলেন তিনি চিকিৎসাতে। সেরে উঠেও লাঠি ভর করে চলতে পারেন খালি অল্পস্বল্প। তাঁর নাকালের কথা, সে তো আর জানতে বাকি নেই কারও চার ধরতিতে। বাইরে চলাফেরার ইচ্ছেটাই চলে গেল তাঁর চিরতরে।

চাঁদনীকে পাবার এই দুরন্ত দুঃসাধ্য সব কার্যকলাপের কথা সাত কাহন হয়ে রাষ্ট্র হয়ে পড়েছিল সারা দেশে। কিন্তু গাল-গল্প হাসি-মজা সেও ঝিমিয়ে এল ক্রমে ক্রমে। তারপর চাঁদনী একাই আছে বিজন বাড়িতে তার। সেখানে সারা বচ্ছর খালি ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, ধোঁয়া ওঠে পাকশালে, বুড়ো খুরপি হাতে ঘোরে বাগানে। কেউ আর আসে না বাইরে থেকে। ভুলে গেল কি এতদিনে সবাই চাঁদনীকে? এমন কালে একদিন স্বয়ং সম্রাটের দূত এসে ঘা দিল ফটকে।

কাঠুরে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে অনেক দিন বাদে এমনি ডাক শুনে।

"এই কি পুরী রাজকন্যা চাঁদনীর?"

"আপনি?"

"মহামান্য সম্রাট তলব পাঠিয়েছেন চাঁদনীকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।" ব'লে সে সম্রাটের মোহর বের করলে বুড়োর সামনে। পালকি দাঁড়িয়ে আছে ওই গাছতলায়।"

বুড়ি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল পাছটাতে। সে শুনে আহ্লাদে উথলে গিয়ে পড়েছে চাঁদনীর দোরে, "শোন্ রে শোন্ মেয়ে, তোর ভাগ্যি, স্বয়ং মহারাজা লোক পাঠিয়ছেন তোকে আবাহন করে—"

চাঁদনীকে দেখে তখন চৈতন্য হয়— খুশির বদলে কালো কেন মেয়ের মুখ? সে বলে, "মা গো, দূতকে বলো, সামান্য মেয়ে, সম্রাটের কাছে যাবার যুগ্যি তো নই!" বুড়ো এলে তাকেও বলে এক কথা, "বাবা গো, দূতকে বলো কত বড়ো দেবতা-সমান রাজা, যেন ক্ষমা করেন গাঁয়ের মেয়েকে।"

দূত ফিরে গেল। কিন্তু সম্রাট বিব্রত হয়ে পড়লেন কথা শুনে। সম্রাটের আমন্ত্রণ যে সম্রাটের আদেশ! সে বোধ নেই? কিন্তু তিনিও তো কত দিন

থেকে শুনেছেন চাঁদনীর অপরূপ রূপের কথা। এবার তলব পাঠালেন তিনি মেয়ের বাপকে।

মেয়ে যা বলেছে, বাপের তো তা সাধ্যি নয়। কাঠুরে শোনা মাত্রই ভয়ে শঙ্কায় চলল দূতের সঙ্গ নিয়ে। শহরে পা দিয়েই তার বুক দুরুদুরু। সভায় ঢুকতে কেঁপে যায় পা। রাজার সামনে মাথা নুইতে থুবড়ে বসে পড়ে ভুঁয়ে। গড় হতে গিয়ে মাথা আর তুলতে পারে না যেন। রাজা কিন্তু সদয় কথা বললেন কাঠুরেকে। সে পাবে রাজপুরুষের পদ। সে পাবে জীবনভোর বৃত্তি। সব সে পাবে যদি নিয়াসে মেয়েকে রাজপুরীতে।

সে আর কী বেশি কথা। রাজা এত মান দিচ্ছেন গরিব কাঠুরেকে, মেয়ে কি চাইবে না বাপের মান হোক এমনিধারা? কাঠুরে খুশি মনে বাড়ি ফিরল। ফিরে বলে চাঁদনীকে সব কথা। "দেখ্ কত বড়ো রাজা, কত ভালো দেখ্, কত বড়ো মন। শোন্ মা, রাজা নিশ্চয় তোকে করবেন পাটরানী। একটু সন্দ সেই মা আমার তাতে, তুই তা হলে—"

চাঁদনী দাঁড়িয়ে নিশ্চল হয়ে। তারপর কান্না গলাতে বলে, "বাবা তুমি ধন মান্যি ঐশ্বর্য পাও, তার চাইতে কী বা আমার চাইবার আছে। কিন্তু বাবা, আমার যে যাবার উপায় নেই! যদি জোর করো, পালিয়ে যাব, মরব আমি মাঝপথে। কেউ আমায় ধরতে পাবে না বাবা—"

বুড়ো পড়ল মহা ফাঁফরে। মেয়ের কান্না সে চোখে দেখতে পারে না. আবার রাজাকে অমান্যি করার ভয়ে হিম বয়ে যায় তার শিরদাঁড়া বেয়ে। কী করবে সে এখন?

কিছুই সে করল না। ভয় বুকে চেপে বাড়িতেই রয়ে গেল—

আর ওদিকে সম্রাট ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলেন দিনে দিনে— এত সাহস?

একদিন শিকারে বেরিয়ে রাজা পশুর পাছু নিয়ে চলে এসেছেন অনেক পথ। হঠাৎ দেখেন ভারি সুন্দর বাড়ি একখানা হাতা ঘেরা। কার এমন

বাড়ি এই অজগাঁয়ে?

পথের লোকে বলে, কেন? চাঁদনী রাজকন্যার—

সম্রাট এক্কেলা পাঠালেন রক্ষী সেনাদের দিয়ে।

কাঠুরে-কাঠুরেনী দুজনেই বেরিয়ে এসেছে কৌতূহলে। দেখে, ও মা! ঘোড়ার পিঠে সম্রাট নাকি স্বয়ং? গড় হয়ে ভুঁয়ে মাথা ঠেকায় দুজনাতে। সম্রাট ঘোড়া থেকে নেমে ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা ঢুকে যান ফটক পেরিয়ে একদম অন্দর ঘরের মুখটাতে— ঘরে ঢুকবেন, তার আগে দোরের চিক একটু সরিয়েছেন খালি আঙুল ঠেলে— চোখে আঁধি দিয়ে উঠল তীব্র সবুজ ঝলসানি— চোখে হাত চাপা দিয়ে পিছিয়ে এলেন রাজা। তারপর একটুখানি চোখ সয়ে ফের চিক ফাঁক করে দেখেন সবুজে সাদায় মেশা উজ্জ্বল একটা আলোর মণ্ডলের মাঝখানে পরমা রূপসী এক মেয়ে শান্ত হয়ে বসে আছে সাতপুরু জাবুতোনের ওপরে, দুটো হাত কোলের 'পরে মেলা, দুধারি বিনিয়ে পড়েছে চুল যেন তারার আভা লাগা রাতের সাগরের মতো কালো, মুখখানা—

মুখ দেখে মনে হয় সে যেন এ জগতের নয়, দেবদেশের। ঘরে ঢুকে, নাম মান ভুলে হাঁটু ভর করে তার সামনে বসে পড়লেন সম্রাট। বললেন, "রাজকন্যা চাঁদনী, কানে যা শুয়েছিলাম, দেখে বুঝছি সে কিছুই নয়। তারা কেউ দেখে নি তোমাকে। কিন্তু এ তো তোমার ঠাঁই নয় রাজকুমারী। তুমি চলো আমার সঙ্গে রাজপুরী।"

চাঁদনী মাথা নাড়ে নীরবে।

রাজা বলেন, "তুমি কী দুঃখে পড়ে থাকবে এই বনদেশে। তোমার সত্যি ঘর যে রাজার রাজপুরীতে!"

চাঁদনী তখন মুখ ফুটে বলে কেবল, "সে হয় না মহারাজ।"

"কেন হয় না!"

চাঁদনী বলে, "আপনি রাজা, আপনি কি বোঝেন না আমি এখানকারের

কেউ নই?"

রাজা বলেন, "হবে তুমি এখানকারের। পাটরানী হবে তুমি এ রাজ্যের।"

চাঁদনী কেবল বলে, "সে হয় না মহারাজ।"

আবেগে অন্ধ হয়ে রাজা তখন হাতে ধরে টেনে বের করতে যান তাকে। পা বাড়িয়েছেন, নিশ্ছিদ্র একটা ঘন অন্ধকার হঠাৎ ঝুলে পড়ল মুখের ওপরে— কিচ্ছু আর দেখা যায় না খালি কালো, কালো— রাজা অন্ধের মতো হাতড়াচ্ছেন চার ধারে— ফেরার শুলুকটুকুও মোছা হয়ে গেছে নিঃশেষে—

"রাজকন্যা কোথায় তুমি? কোথায়? বেরোবো কোন্ দিকে? দোর কোথায়?"— পাগলের মতো হাতড়ে ঘুরতে ঘুরতে সেই কালোর ভেতরেই বসে পড়লেন রাজা নিরুপায় হয়ে— "রাজকন্যা কোথায় তুমি?" সাড়া নেই কোনোদিকে। তারপর বলেন, "ক্ষমা করো আমায়, রাজকন্যা। রাজমদে মত্ত হয়ে ভাবছিলুম, রাজার চাইতে ক্ষমতা আর কার? ভুল বুঝলাম রাজকন্যা আমার ক্ষমা করো—"

বলার সাথে-সাথেই আলোয় হেসে পড়ল ফের ঘর। রাজা দেখেন তিনি সেই দোরমুখেই দাঁড়িয়ে আছেন। চাঁদনী বসে তার সাতপুরু জাবুতোনের 'পরে, দুটো হাত কোলের ওপরে মেলা, দু ধারে বিনিয়ে গড়েছে চুল যেন তারার আভা লাগা রাতের সাগরের মতো কালো—

মাথা নুয়ে বিনতি করে তখন বলছেন সম্রাট, "এমন তো দেখি নি কোনোখানে জীবনেও, তোমায় আমি ভুলতে পারব না, রাজকন্যা। তবে জেনো, আর আমি আসব না কোনো আবাহন নিয়ে।"

সম্রাট ফিরে গেলেন।

আরো বছর কেটে গেল। আরো বুড়ো হয়ে গেল কাঠুরে-কাঠুরেনী। একা একা থাকে চাঁদনী— কী লেখা লেখে, কী ছবি আঁকে, কী কারু করে

সারাদিন বসে বসে। বাড়ির বার হয় না একবারও, ডাকে না কাউকে ঘরে। কেবল নতুন একটা নেশা হয়েছে তার— চাঁদ দেখার। চুপ করে চেয়ে থাকে ঝরকায়। খোলা বাগানে দাঁড়িয়ে গিয়ে দেখে সাঁঝরাত থেকে মাঝরাত চাঁদের মন্থর পরিক্রমা।

শুধু কাঠুরেনীর ভালো ঠেকে না ব্যাপারটা— চাঁদ দেখা নেশা তো ভালো নয়! সে যে আকারণ দুঃখু ডেকে আনে। তবু জানে ভুলক্রমে যদি মুখ ফুটে বলে তার অশান্তি, চাঁদনী গিয়ে দোর দেবে ঘরে, বেরোবে না সাত দিনেও।

ভার দিনগুনো। শান্তি নেই যেন কারও মনে। কাঠুরে কেন যে চুপ করে বসে থাকে উঠোনে! কাঠুরেনী ফুল তুলে পুজো ক'রে তাড়াতে চায় মনভার। কারণে-অকারণে কেন যে চোখের জল ফেলে চাঁদনী। বুড়োবুড়িতে একজোটে হয়ে এসে বলে, কেন এমন চোখের জল ফেলিস মেয়ে। কিসের দুঃখু তোর?

তখন চাঁদনী বলে, "বাঁশের মূল থেকে আমায় এনেছিল গো বাবা। মা আমায় কত যত্নে করে তুললে এতখানিটা। কিন্তু মা গো, আমি যে এখানকারের কেউ নই!"

"এতকাল রয়েছিস আমাদের ঘরে। এখনও বলিস, এখানকারের নোস তুই?" বুড়ি বলে, "বল্ তবে তুই কে?"

"মা গো, আমার দেশ ওই চাঁদের দেশে। কতদিন থেকে শুনি আমার সে দেশের পাড়ার ঘরের মানুষ সব, সঙ্গী-পরিজন আমার— ডেকে ফিরছে খালি— হাওয়ার রাতের জ্যোচ্ছনার ছোঁয়া লাগে আর গলা শুনতে পাই তাদের, চাঁদনী— চাঁদনী— কেবলই ডাকছে আমায়।"

"আর আমি থাকতে পারব না মা গো, ঠিক জানি ওরা এসে নিয়ে যাবে আমায় এবারে।"

বুড়োবুড়ি শোনে নিরুত্তরে।

চাঁদনী বলে, "আমার মন পুড়ছে গো মা রাত্রিদিন, বুকে করে বড়ো করলে, কী করে ছিঁড়ে যাই! আর যারা আমায় ডাকছে সর্বক্ষণ— তারাও যে আমার কতকেলে আপনার লোক। তাদেরই বা ছেড়ে থাকি কতকাল?"

"রোজ রোজ এসে আমায় মনে করিয়ে দিয়ে যায়, চাঁদনী— এবারে ফিরতে হবে কিন্তু, চাঁদনী— ঝালাপালা করছে ঘুমের ভেতরে—"

"যদি না ছাড়ি তোকে?" বুড়োবুড়ি বলে কঠিন হয়ে। "যদি না দি যেতে?"

"ধরে রাখতে পারবে না গো আমায়। ওই যে শ্রাবণের সাত কলা চাঁদ উঠেছে জলধোয়া আকাশে, আস্তে আস্তে ভরে উঠবে কদিন পরে। আর, তখন আর তোমরা আমায় ধরে রাখতে পারবে না।"

"জোর করে নিয়ে যাবে ছিনিয়ে? এত জোর?" বুড়ো যায় দাসদাসীদের সজাগ করে আসে, যেন কেউ অচেনা না আসতে পারে কাছেপিঠে। তারপর বলে ফিরে গিয়ে, "তোকে আমরা ধরে রাখব, আঁকড়ে রাখব, দেখি কে পারে নিয়ে যেতে।"

অষ্টমী, নবমী, দশ কলা পূর্ণ হল চাঁদ। রাতের বাতাস আর জ্যোৎস্না যেন ভরে উঠছে অশরীরী চলাফেরায়। বুড়োও যেন টের পায় কারা অশরীরী ঘিরে আসছে তাদের বাড়ির চার পাশে। ভোর হলে অব্যাজে সে চলে গেল রাজসভাতে— "মহারাজ! রক্ষা করুন!"

"কী হয়েছে তোমার?"

চাঁদনীকে নিয়ে যেতে লোক ঘুরছে অহোরাত্র আমার বাড়ির চার পাশে।

"কারা সে লোক? চেনো?"

বুড়ো আগাগোড়া বলে সকল কথা। বনে বেণুকুমারীর জন্মকথা। চাঁদনী নামের কথা। তার নানা বিদ্যে শেখাপড়ার কথা। তাকে পেতে বীরকুমারদের দুঃসাধ্য সাধনের সব বিবরণ, তারপর বলে, "তারা

এখানকারের কেউ না মহারাজ। মহাশক্তিধর তারা— চাঁদনী বলে। তারা আসছে চাঁদের দেশ থেকে। চাঁদনীকে কেউ আর ধরে রাখতে পারবে না।"

"এত শক্তি তাদের? বেশ! দেখি তবে একবার।" ব'লে রাজা বুড়োর সঙ্গে দিয়ে দিলেন তাঁর সেনাদলের সহস্র বীর যোদ্ধা। এরা কারও কাছে হারে নি কোনো দিন। বললেন, পূর্ণিমা অপরাহ্ণে তিনি নিজে যাবেন কাঠুরের বাড়ি।

আঁচিলে পাঁচিলে কানাচে কোণায় রুজু রুজু সৈন্য মোতায়েন হল কাঠুরের বাড়ি। রাজা বলে দিয়েছেন চোখের পলক না পড়ে, একটি পতঙ্গও না গলতে পায় সেনাপাঁচিল গলে। তাদের উদ্যত তীরকিরীচের 'পর দিয়ে রাতের আলো, রাতের বাতাস বইতে লাগল সারা রাত। তারা জেগে রইল নিষ্পলকে।

এমনি করে দিনে দিনে এল শ্রাবণপূর্ণিমা। রাজা স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন ফটকগোড়ায়। তৈরি তো সবাই? রুদ্ধশ্বাস তৈরি হয়ে আছে কখনও-না-হারা সহস্র মহাবলী যোদ্ধা।

তৈরি তো সব ঘরে?

চাঁদনী বসে আছে মাঝখানে, তাকে চার পাশ বেঁধে রয়েছে কাঠুরে-কাঠুরেনী আর সাত দাসী মিলে। কথা নেই কারও মুখে।

পূর্ব দিক্‌প্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে মাথার উপরে উঠে এল শ্রাবণপূর্ণিমার চাঁদ— বাগানের মাথায়, বাড়ির চালের ঠিক শীর্ষে। টুপটুপ্ করে জ্যোৎস্না ঝরছে বাগানের ডালপাতা থেকে, জ্যোৎস্নায় কাঠের চৌচাল জ্বলছে আগুন বরফের মতো। চার পাশ ছড়ানো উদ্যত তীরকিরীচের 'পরে জ্যোৎস্না গলে পড়ছে উথোল দিয়ে, বীর সাজে সাজা লোকগুনো নেয়ে উঠল চাঁদের আলোর বন্যায়। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে? চাঁদ যেন হেলেছে ঈষৎ পশ্চিমে। সাদা আগুন দিয়ে গড়া অতখানি সুপূর্ণ চাঁদ— দেখতে দেখতে আচমকা গোটা আকাশ ছেয়ে গেল তীব্র সাদা আগুনের নিঃশব্দ বিস্ফোরণে।

জ্যোৎস্না এত খর, যেন চাওয়া যায় না। তারই ভেতর চোখ সয়ে দেখা যায় শীর্ষ আকাশ থেকে পেঁজা মেঘের একটা মালা ভাসতে ভাসতে নেমে আসছে হু হু করে। নেমে এল একদম ওই গাছের মাথায়— তখন দেখা যায় মেঘের পাপড়ি তো নয়, রামধনুর জামাজোড়া পরা ফুরফুরে ডানা উড়োনো অসংখ্য ক্ষুদে মানুষ—

পরীমানুষ! পরীমানুষ! অস্ফুট চীৎকার করে উঠল কারা আশেপাশে, আর সঙ্গে সঙ্গেই এক সাথে সহস্র তীর ছুটল তাদের লক্ষ্য করে— তাদের পার হয়ে ভেসে হারিয়ে গেল তীর। ফের ছুটল সহস্র তীর, ফের, উপর্যুপরি— তাদের স্পর্শও করল না।

আরো নীচে নেমে এল তারা। যেন চাঁদের আলোর একটা পথ বাঁধা ঠিক এক-মানুষ উঁচুতে, সেখানে সোনার কাজ করা গোলাপি ফুলের দল দিয়ে গড়া একখানা পালকি নামল এসে। "চাঁদনী—"

মনে হয় সমস্ত রাতের বাতাস একগলাতে পঞ্চমে ডাক দিয়ে উঠছে, "চাঁদনী—"

কী যে শক্তি সে ডাকে, বুঝতে পারে না বুড়োবুড়ি। শুধু টের পায় অস্থির আনচান হয়ে উঠছে মেয়েটা, যেন ছিঁড়ে দাঁড়িয়ে উঠতে যায়, তাকে ধরে রাখতে পারে না তারা।

চাঁদনী দাঁড়িয়ে উঠে ওপরের জামাটা তার খুলে ফেললে। বুড়োর হাতে হাত দিয়ে বলে, বাবা আমার এই স্মৃতি, রেখে দিয়ো।

ঘরের কুলুঙ্গি থেকে টেনে নিয়ে একটা গুটোনো কাপড় খুলে বলে, এইটি দিয়ো রাজাকে। আমার একটা পদ্য লেখা। কত কী ছবির ভেতরে জ্বলছে যেন লেখার হরফ-কটা—

ফের তুলে নেয় একটা ঘট। "বাবা, এইটিও দিয়ো রাজাকে। এর ভেতরে আছে অমৃতবারি, একবিন্দু যে খায় সে পায় অখয়া যৌবন।"

ব'লে বুড়ির কাছে এসে বলে, "আমায় আদর করবে না মা?"

বুড়োবুড়ি দুজনে হাত রাখতে যায় তার মাথায়— ঝড় দিয়ে খুলে গেল দোর— দেখে, ঘর ভর্তি উথোলিপাথলি সাদা দুধের মতো চাঁদের আলো— চাঁদনীর রেখে যাওয়া জামা, তার ছবি, তার ঘটটুকু নেয়ে উঠল ডুব-জ্যোৎস্নাতে। বুড়োবুড়ি ছুটে বেরিয়ে যায় উঠোন পেরিয়ে, দেখে পালকি রওনা দিয়েছে চাঁদের আলোয় বাঁধা সেই সড়কপথে— রামধনুর জামাজোড়া পরা শও বেহারা— ডানা ফুর্‌ফুর্‌ পরী সব— তাদের কাঁধে কাঁধে ভাসতে ভাসতে একটু একটু করে বিন্দুর মতো হয়ে গেল দৃশ্য, তারপর মিলিয়ে গেল অবিরল জ্যোৎস্নার ভেতরে। তখনও পশ্চিমে হেলে আছে সাদা গোলার মতো সুপূর্ণ চাঁদ, আগুনবরফের মতো জ্বলছে ঘরের চৌচালাখানা।



ফুজি পাহাড়ের তীর্থ

রাজা ফিরে ফিরে পড়েন চাঁদনীর ছবি-আঁকা পদ্যটুকু। ঘটের বারি তিনি স্পর্শ করেন নি। আর তাঁর আস্বাদ নেই জীবনে।

মন্ত্রীকে ডেকে বলেন, "বলতে পারেন, এ দেশের কোন্ জায়গা স্বর্গের সবচেয়ে কাছে?"

"কেন মহারাজ, ওই যে ফুজি পাহাড়!"

"তবে আমি থাকব গিয়ে ওই ফুজি পাহাড়ে।"

"বেশ তো মহারাজ। ব্যবস্থা করি। যাবার, গিয়ে থাকার।"

"কত দিন লাগবে ব্যবস্থাতে?"

"কটা দিন তো লাগবে মহারাজ। পথ তো কম নয়। একটা আশ্রয় গড়তেও তো লাগে কয়েকটা দিন।"

"বেশ! তবে আমার অবর্তমানে রাজ্যের দায়িত্ব আপনার।"

মন্ত্রী নীরবে দাঁড়ান মাথা নিচু করে।

"দেখবেন, রাজ্যে প্রজারা থাকে শান্তিতে। উপদ্রব না হয়।"

"আমি তবে যোগাড়ে বেরোই মহারাজ। কাল আসব সকালে।"

পরদিন গিয়ে দেখেন সভা বসে নি, পুরীর ভেতরে লোকজন বসে আছে শূন্য চোখে।

মহারাজা?

রাজা চলে গেছেন উষাভোরে, একা। দুয়োররক্ষীকে বলে গেছেন, কেউ তাঁর খোঁজ না করে।



ফড়িঙের কবিতা

জাপান দেশের পুরোনো সব নামের একটি নাম হল আকিৎসুশিমা, অর্থাৎ মহাফড়িঙের, গঙ্গাফড়িঙের দেশ। একটা ফড়িঙের লক্ষণ ধরিয়েই কথাটা লেখা হয় জাপানী ভাষাতে। যে ফড়িঙকে আজ সবাই বলে তোম্‌বো, তারই পুরোনো নাম আকিৎসু। দেশের পুরাণকথাতে বলে, আজ থেকে প্রায় সাতাশশো বছর আগে সম্রাট জিম্মু একবার মস্ত পাহাড়ে উঠে তার চুড়ো থেকে দেশটাকে হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা ফড়িঙ যেন পিছ ফিরে লেজ টুকছে— অনেকটা সেই রকমের আকৃতি। আজ এত কাল পরেও জাপানের এম্‌ব্লেম্‌ বা প্রতীক-দেশচিহ্ন একটা ফড়িঙ।

প্রায় পঞ্চাশ ধরনের ফড়িঙের দেখা মেলে জাপানে। লাল কালো সবুজ সোনালি— নানা ধারা তাদের রঙের বাহার। লাল ফড়িঙ হল আকা-তোম্‌বো, শোজো-তোম্‌বো হল টকটকে লাল বর্ণের ফড়িঙ। ওরি-য়াম্মা দানব ফড়িঙ, কি-য়াম্মা আর য়ুর্চি তোম্‌বো দু জাতের ভূত ফড়িঙ। তা-নো-কামি-তোম্‌বো ধানক্ষেতের দেব-ফড়িঙ। শরতের পতঙ্গ এরা, এদের বলে আকিৎসু-মুশি।

জাপানে দু চোখের ঋতু হল বসন্ত, চোখ ভরে ওঠে তখন প্রকৃতির

শোভায়। আর শ্রবণের কাল শরৎ, হাওয়াবাতাস ভরপুর হয়ে ওঠে তখন পতঙ্গগুঞ্জনে। এদের মধ্যে রা নেই শুধু ফড়িঙ পতঙ্গের, পরীদের মতো নিঃশব্দ রঙিন আলোর ঝিলিক তুলে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়। লোকে বলে, প্রাণের সাধ আর আশা ভাসিয়ে তোলে বসন্তকাল, আর শরৎ শুধু বিষাদ আর স্মৃতির গুঞ্জনে ভরা— চলে যাওয়া দিন আর লুপ্ত সব মুখ সে মনে করিয়ে দেয় ক্ষণে ক্ষণে।

অজস্র ছোটো ছোটো কবিতা লেখা হয়েছে জাপানে, শরতের এই প্রধান পতঙ্গটিকে নিয়ে, তার কয়েকটি এখানে তুলে দি।

১

শরৎ এসে গেছে, সে কথা
জানতে পারলুম হাওয়ায় ওড়াউড়ি
লাল ফড়িঙ-ঝাঁক দেখে।

২

আহা ফড়িঙ ফড়িঙ, পুরোটা
গা তোর ছুপিয়ে আসলি যে দেখি
সদ্য শরৎ-রঙে!

৩

শরৎ-ছোপানো ডানাজোড়া, লালে লাল
সারা গা— পুচ্ছ অবধি—
ও ফড়িঙ, রাঙা ফড়িঙ!

৪

ফিন্‌ফিনে উর্ণার ওড়না যেন
ঝিলকে উড়ে যায় ধাঁধা দিয়ে
ফড়িঙ, ঝাঁক-বাঁধা শুধু ফড়িঙ!

৫

কালির দাগ লাগালে জামাটাতে?
কালি? কোথায় কালি? জামায় ব'সে
কালো ফড়িঙটা জিরোচ্ছে, দেখছ না?

৬

ও ফড়িঙ, মহাফড়িঙ, গঙ্গাফড়িঙ,
সেই থেকে বসে আছিস শান্ত জাব-কাটা গোরুটার
শিঙের ছুঁচলো আগায় ছবির মতো।

৭

পুকুরজলে ঝুঁকে
উড়ছে ফড়িঙ, জলের ঘোর লেগে
আরো গভীর লাল।

৮

ঘাসে ঘাসে ঘুরে ক্লান্ত, তাই কি
সামনে কিছু না পেয়ে
ফড়িঙ বসেছে মেঠো গোরুটার শিঙে?

৯

ওই দূর নীলে দল বেঁধে ওড়পাড়!
নীচে মনে ভাবি কালো করে আছে
ফড়িঙ না, ঝাঁক মশা।

১০

আহা ফড়িঙ ফড়িঙ সারাটা দিন
খেলা কেবল খেলা, যতক্ষণে
সাঁঝতারাটি মুখ না দেখায় আকাশে।

১১

গোঁত খেয়ে খেয়ে পড়িস ফড়িঙ— কেবলই
ফুল পাতা ঘাস যা পাস বসিস টুঁস দিয়ে দিয়ে সমানে
সে কি মুখে কথা দেয় নি বিধাতা, তারই রাগ?

১২

পলকা যে ডালে পাখিও বসতে ডরায়—
ফিন্‌ফিনে তারই আগায় দিব্যি গিয়ে
বসে আছে মহানন্দে ফড়িঙ, ভ্রুক্ষেপ নেই
কিছুতে।

১৩

ফড়িঙ উড়ে যায় পাতার নীচটাতে— বর্ষা!
শরৎ-বৃষ্টির হঠাৎ রিমঝিম ফড়িঙের
দু ধার বয়ে পড়ে, গায় লাগে না এক বিন্দু!

১৪

নেশাড়ু ওই মাছধরা লোকটার
ছিপের দাঁড়ায় ফড়িঙ উড়ে এসে
বসল, এবার ঘুমোবে দিনভর।

১৫

ফেনার বুদ্‌বুদ্‌— হাওয়াভাসা—
তারই ভেতর দিয়ে ফড়িঙ উড়ছে যেন
স্বপ্ন থেকে স্বপ্নে রয়ে রয়ে।

১৬

সূর্য ডুবে গেছে। আবছায়া
জগৎ চরাচর। আলোর বদ্‌লি এখন ঝাঁক-বাঁধা ফড়িঙ
উড়ছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে।





যাঁতা ঘুরোও ইচ্ছে পুরোও

দুই ভাই।

যেমনটি হয়— ভারি কাজেকর্মে বড়ো ভাইটি, চালাক-চতুর, আর ছোটোটি একেবারে নিষ্পদার্থ। কাজেই বাবা-মা মারা যেতেই বড়ো বলল— "অকম্মার ধাড়ি তুই একটা, কদ্দিন বসে বসে খাবি আমার ঘাড়ে!"

ছোটোকে আলাদা করে দিল বড়ো ভাই। কিন্তু দেখা গেল ছোটোর ভাগে কিছুই প্রায় পড়ে না। যেটুকু ঘরজমি টাকাকড়ি— সবই বড়ো ভাইয়ের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আপনার উপার্জন। দুটো-চারটে কড়ি-কাহন যা মিলল— সে কী আর মহামূল্য কিছু ওবান-কোবান! ভিটের এক কোণায় কোনোমতে হোগলার একটু চালা বেঁধে গুছিয়ে নিতেই তা সুন্‌সান্‌ হয়ে গেল। ছোটো বৌকে শুনিয়ে গেল বড়ো বৌ— "দেখেশুনে করো এবারে ঘর। দেখ কত ধানে কত চাল।"

ভারি অপায়ে পড়ে গেল ছোটো ভাই।

না আছে বিদ্যে, না সম্বল— কী করে! কোনোমতে দা-কুড়ুল একটা জুটিয়ে ছোটো ভাই বেরোলো বন ভেঙে কাঠ কুড়োতে। বেচেবুচে জোটে যদি আধপেটা—

এমন বিপদেও পড়ে মানুষে!

সত্যিসত্যিই কাজকম্মের অভ্যেস তত ছিল না ছোটোর। তবু নেংচে খুঁড়িয়ে যেমন করেই হোক, দিন কি আর বসে থাকে!

দেখতে দেখতে এসে গেল বচ্ছরকার শেষ দিনটি। অতিবড়ো ভিখিরি-নির্ধনও এই সংক্রান্তির দিনটির জন্যে চেয়ে থাকে বছরভোর— আসছে বছরের ভালো কামনা ক'রে মানত করে তোশিগামি ঠাকুরের কাছে, পুজো-ভোগ দেয়, পড়শি-পরিজনকে ডেকে যার যেমন উপায়— ভাগাভাগি করে খায় এক-আধ টুকরো ফলপাটালি— এতকাল ধরে দেখে আসছে ছোটো ভাই।

কিন্তু সে গেছে আরেক দিন। আহ্লাদ করে ডেকে আনবে কাউকে ঘরে সে তো দূর, বচ্ছরকার দিনে পুজোটুকু দিয়ে আসবে ঠাকুরের থানে— সেও স্বপ্ন। ভাবতে বসলে হাত পা চলে না।

"যাও না দাদার কাছে একবার—"

চুপ হয়ে বসে থাকতে দেখে ছোটো বৌ ঠেলল এসে তাকে— "যাও না ধার করে নিয়েসো না চাল খানিকটা, পিঠে গড়ি। পরে শোধ দিয়েলেই তো হল?"

হ্যাঁ, তা অবশ্য একটা উপায়।

ছোটো গেল বড়ো ভাইয়ের কাছে। "একটু চাল ধারতে এলুম দাদা। বচ্ছরকার দিন। নৈবিদ্যিটুকু দোবো, তাও ঘরে নেই।"

"কী বললি? ছিলি নিষ্কম্মা, তার ওপরে হলি আবার মিথ্যেবাদী?"

"কেন দাদা।"

"লোক নেই জন নেই, দুজনার ঘর। ভরদিন ঘুরছিস রোজগারের ধান্ধায়। তোর ঘরে চাল নেই? তুই এয়েছিস ধারতে? বড়ো বোকা ঠাউরেছিস তো আমায়! — শুনছ কথা ছোটোর?—"

ডাকবার আগেই বৌ এসে হাজির. . .

"যা যা ঘর যা, ঘর যা—"

তাড়া খেয়ে ছোটো ফিরল মুখ চুন করে। ঘরে ফিরল না। তার আবার ঘর! কী হবে ঘরে গিয়ে? যাবেই বা কোথায় ঘরে? চলতে লাগল সে, চলতেই লাগল। গিয়ে পড়ছে জঙ্গলে। গোলমাল লাগছে মাথার মধ্যেটা, নজরই পড়ে না কিচ্ছুতে। এদ্দিনে, কেবলই মনে হতে লাগল, কপালটা তার ভারি মন্দ।

হঠাৎ একটা হুশহাশ আওয়াজে চমকে চেয়ে দেখে ঠাস জঙ্গল চার পাশে, আর বুড়োহাবড়া লোক একটা শব্দ করে ক'রে জ্বালানি ভাঙছে শুকনো ডালের। মুখ ফেরাতেই— আভা-গিরিমাটির রঙ সন্নেসী-হোতোকের মতন চেহারা, এগিয়ে এল— "কোথা চললে হে?"

"না, কোথায় আর যাব!"

"ঘর যাও ঘর যাও বাপু, কেন ঘুরছ গোলকধাঁধার বনে?"

সন্নেসী-হোতোকের মতন মুখখানা। ছোটোর বুকটা হালকা লাগল একটুখানি· সদয় কথায় আঁচ পেয়ে। "কোথায় যাব ঘরে? বেলা গেলে তোশিগামির পুজো। ঘরে নেই কিচ্ছু বলতে। নিজের দাদা— ধারটুকুও দিলে না, দিলে তাড়িয়ে।"

বুড়ো এসে পিঠে একবার হাতটা বুলিয়ে দিতে সারা গা তার যেন আরো নরম হয়ে গেল।

"এই নে বাবা—" খুঁটে হাত ঢুকিয়ে বুড়ো বের করলে— যা মনে ভাবলে জিভে জল এসে যায় সক্সক ক'রে— সেই ছোট্ট একথাবা মান্জু-পিঠে। "নে, ধর এইটে—"

ছোটো অবাক। "নে, ধর বলছি!"

হাত পেতে নিল ছোটো।

"দেখিস, আপনি খেয়ে ফেলিস নে। বনে বনে চলে যা আরো খানিকটা, দেখবি বনের মধ্যে বনদেবতার থান। দেলবাড়ির উঠোনে প্রেণাম

করে ঠাকুর প্রদক্ষিণ করে, চলে যাবি পেছনবাগে। দেখবি জঙলা-ঢাকা একটা সুড়ঙ্গের মুখ— আগলে বসে আছে এক দঙ্গল কোবিতো। জানিস তো, আর যে পারুক— মান্‌জু পিঠে দেখতে পেলে কোবিতোরা কিছুতে সামলাতে পারে না নিজেদের।

ছোটোর নিজেরও জিভে জল এসে গিয়েছিল। মুখ কচলাচ্ছে, বুড়ো বলল, "দেখলি তো। দেখবামাত্র ভিড়িয়ে এসে চাইতে থাকবে সব। চাইবেই! না চেয়ে পারে?"

"হ্যাঁ, দিবি তো বটেই। তবে সুড়ঙ্গের মেঝতলায় ওদের যে যাঁতাজোড়া আছে সেইটে যদি দেয়, তবেই কিন্তু দিবি। আর শোন্, নিজের জিভটা সামলে চলবি রাস্তায়— যা—"

বুড়ো আরেকবার হাতটা বুলিয়ে দিল তার পিঠে। "যা চটপট— এদিক সেদিক না চেয়ে সোজা চলে যা তোশিগামির নাম নিয়ে।"

আবার হাঁটা ধরল ছোটো। গেছে এক-আধ রি, আচমকা এক জঙলাধরা দেউল, পেছনবাগে যেতেই দেখে এতটুকুটুকু মানুষ এক দঙ্গল— বালখিল্য মুনির দল— ভনভনানি আওয়াজ তুলছে একঠাঁই জমাত হয়ে, নজর করে দেখে চোরকাঁটার বনে আটকা পড়েছে কজনের আঙুলপ্রমাণ হাকামা-পায়জামা— যত টানছে আটকে যাচ্ছে ততই, আর ভনভনানি তো নয়, চিৎকার পাড়ছে পরিত্রাহি।

ছোটো ভাই ঝুঁকে পড়ে যত্ন করে ছাড়িয়ে দিল তাঁদের পাজামার আঁকড়িকাঁটা—

"কে হে তুমি?" — ভারি খুশি সবাই ছোটোর ওপরে। নতুন লোক দেখে ভিড় করে এল আরো পাঁচজন— "হাতে আবার কী ওটা তোমার?"

"মা ন্ জু?"

"আরে মা ন্ জু- পিঠে মা ন্ জু- পিঠে— " একটা রোল পড়ে গেল যেন উল্লাসের—

"পেলে কোথায় মান্‌জু-পিঠে?"

কে আর অপেক্ষা করে ছোটোর বলার! "কোত্থেকে নিয়েলে মান্‌জু পিঠে? দাও, দাও, এখ্‌খুনি দাও।"

ক জন ধরাধরি করে এনে ফেলল সোনার মোহর এক ছালা— "নাও, এই নাও, সব তোমার!"

"না না, সোনাদানা চাই নে আমার।"

"কী চাই তবে? বলো বলো", তর সইছে না আর কারও। "বলো, কী চাও।"

"মান্‌জু-পিঠে দিতে পারি—" ছোটো একটু একটু করে বলল ভেঙে— "যদি দাও তোমাদের যাঁতাজোড়া!"

"যাঁতা!" মুহূর্তে থমকে গেল গোটা দলটা।

"কিসের যাঁতা?"

শিখেপড়ে এসেছে ছোটো, অত সহজে ভোলে? "মান্‌জু পিঠে নিতে পারো যদি পাই তোমাদের যাঁতাজোড়া।"

দু-চারজন প্রধানতম কোবিতো বসল ভাবতে। সারা পৃথিবীতে একটাই এই যাঁতা— এদিক থেকে সেদিক থেকে বাদাবাদি শুরু করল আর পাঁচজনে: এ যাঁতা একটাই— গোটা পৃথিবীতে, কিন্তু আরেক দিকেও যে-সে সামিগ্রি তো নয়. . . চার ধারে যেন ঘোড়ামাছির ভনভনানির সোর— মা ন্‌ জু. . .

জিভ চোকাচ্ছে সামনা সারির কোবিতোরা।

কাজেই শেষঅবধি যাঁতাজোড়া কাঁধে তুলেই ছোটো চলল ফিরতি পথে। গেছে এক-আধ রি, দেখে ঠিক জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো: "পেলি যাঁতা?"

"এই যে।"

"বেশ বেশ। এখন বলো, কী চাও! বলো, আর যাঁতা ঘুরোও ডাইনে। চাই নে আর? তো বাঁয়ে ঘুরোও! অর্থাৎ কি না

ডাইনে ঘুরোও ইচ্ছে পুরোও
থামতে চাও তো বাঁয়ে মুড়োও
বুঝেছ তো?"

সুখে ছটফটিয়ে ছোটো ভাই বিহান না পড়তে ফিরে এল ঘরে। "আজুমা, ও আজুমা, সাধ পুরিয়ে খেতে বলে এসো গো যাকে চাও যাকে না চাও, সব্বাইকে।"

"বলো কী গো। দাদা তোমায় কত মেপে দিয়েছে?" বৌ বেরিয়ে এল দুয়োর ছেড়ে। "কাঁধে আবার ওটা কী?"

বৌ বেরোলো নেমন্তন্নে। আর থাকার মধ্যে থাকা তাতামি চ্যাটাইখানা বিছিয়ে তার ওপর যাঁতাজোড়া পাতল ছোটো—

ডাইনে ঘুরোও ইচ্ছে পুরোও

চনমন করছে মনে মনে। কী ইচ্ছে তার? কী আর! খালি রকমারি খাবারদাবার পিঠে-পুলি মাছটা-আঁষটা পোলাও-মোচি—

ডাইনে ঘুরোও ইচ্ছে পুরোও— ভয়ে-আশায় দু মিশ হয়ে বসে ছোটো ভাই বলল, "*হেই বাবা সাতসাতাই সৌভাগ্য ঠাকুর,* যাঁতা ঘুরুক, দাও আমায় খাবারদাবার পিঠে-পুলি মাছটা-আঁষটা পোলাও-মোচি—" যাঁতা ঘুরতে লাগল জোকো জোকো জোকো জোকো জোকো জোকো

আর অধরধারায় চার ধার থেকে বের হয়ে আসতে লাগল হরেক মেঠাই পিঠে-পুলি

যাঁতা ঘুরতে লাগল হীয়োকো হীয়োকো হীয়োকো হীয়োকো—

আর অধরধারায় চার ধার দিয়ে বের হয়ে আসতে লাগল রাঙা ভাত রাঙা মাছ

বৌ ফিরে এসে সব দেখে তো থ। "সব দুঃখ ঘুচল রে আমাদের

ছোটো বৌ। ঠাকুর তোশিগামি দিয়েছেন আমাদের এই যাঁতা।"

গাঁয়ের বুড়োগুঁড়ো সক্কলকে পরিতোষ করে কণ্ঠাসমান খাইয়ে পথঅবধি তুলে দিয়েলো ছোটো ভাই। "কালকে নতুন বছরের দিনটায় এখানেই যা হোক চারটি—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আর বলতে।" বলল, কিন্তু দারুণ দুর্ভাবনা মনে নিয়ে ফিরল সবাই : "হল কী! খাওয়া জোটে না এক সাঁঝ, সেই কি না—"

বড়ো ভাই বড়ো বৌ প্রত্যয়ই করে নি গোড়ায় ব্যাপারটা। কিন্তু রাত ফুরোবার আগেই দমকা হাওয়া হয়ে খবর ঢুকেছে দেয়াল গলে। এ মোড় ও মোড়, শুতে পারে না স্বস্তি করে : হল কী? তারই ছোটো ভাই। খাওয়া জোটে না এক সাঁঝ। সে কি না—

এ দিকে মাঝরাতে শলা চলেছে ছোটো ভাইয়ের ঘরে। এত লোককে খেতে বললে, বসতে দেবে কোথায়? ঠাঁই কর বাপু একটা। দেখ, নিজেদেরও আর থাকা নয় এইভাবে। একটু সাফসুতরো চমক-ঝমক নিয়ে চলতে হবে বাপু, আর নয়।

তার আর কী!

যাঁতা ঘুরোও ইচ্ছে পুরোও

ডাইনে মোড় নিয়ে যাঁতা ঘুরতে লাগল। ভাঙাচুরো চালার জায়গায় কোত্থেকে কে বসিয়ে দিয়ে গেল সাতমহল পুরী— দাসদাসী গম্‌গম্‌— ওপর-বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখে পড়ে ফুলচারার কোয়ারি করা হাতা— টানা বারমহল দাসদাসীদের— ঘোড়ার আস্তাবল একটেরে— সাত-সাতটা দুধধবল ঘোড়া।

যাঁতা ঘুরতে লাগল।

কী সব পোকআশাক— ঝরকার রেশমি ঝালর— কাঠের দেয়ালে

অপরূপ পটকারী কাকেমোনো, তোকোনামায় জহর-ঝাঁপি, কোণ দিয়ে ইকে-বানা।

যাঁতা ঘুরতে লাগল জোকো জোকো জোকো জোকো জোকো—

আর চার ধার দিয়ে ডাঁই হয়ে উঠতে লাগল ফলফুলুরি মিসোমোচি মিরিন-শারাব

হ্যাঁ; হল সব মনের মতন তৈরি। বাঁয়ে মোড় দিয়ে থামল এবার যাঁতা।

সকাল থেকে নেমন্তিতদের ভিড়। কিন্তু তাদের আর কী কাজ! যা করার করছে দাসদাসীর দল। আওয়াজটুকু নেই, চলছে-ফিরছে, যেন রেশমিনা ছবি। পরিতোষে খেয়ে ফিরছে একটা একটা দল।

এবারকার দলের মধ্যে দাদা-দাদার বৌ। দুজন নেমে গিয়ে নিয়ে এল আপ্যায়ন করে। "যা চাও নিয়ে যাও দাদা ঘরে, সঙ্কোচ কোরো না।"

ব্যাপার কী? এই সমস্ত ঘরদুয়োর লোকজন, খাইয়েদাইয়ে ছাঁদা বেঁধে দিচ্ছে আবার নিয়ে যাবার— ব্যাপারখানা কী? বড়ো ভাই যত খায় তত নেয় মুঠো আঁকড়ে, যত নেয় তত ছটফট করতে থাকে কৌতূহল আর হিংসেয়। এদিক সেদিক এ ঘর সে ঘর উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে হঠাৎ ঝলকে দেখে ফেলে ভেতর-ঘরে চাটাইয়ের 'পরে পাতা একটা যাঁতার চার ধার গলে এবড়োখেবড়ো খাবারের ডাঁই। তা হলে কি—

"যাঁতাটাই তা হলে?"

"হ্যাঁ দাদা।" অসঙ্কোচে কবুল করল ছোটো ভাই।

সারাদিনের ক্লান্তিতে রাত হতে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে যখন দুজন, তারও পরে— নিষুতি ছমছম যখন রাত— বড়ো ভাই এল বেড়াল-চলা পায়ে— ছায়ার গায়ে ছায়া হয়ে। ঠিক ঠাঁই থেকে যাঁতাজোড়া তুলে নিয়ে

বার হয়ে গেল আবার তেমনি নিঃসাড়ায়।

ঘরে নয়। না, এ রাজ্যেই আর না। নৌকো বাঁধা সমুদ্রের কূলে। যাঁতাটা তার ওপর তুলে কাছি খুলে নিয়ে বড়ো ভাই বসল উঠে নৌকোয়। জ্বলছে গহন রাতের আকাশখানা। ঢেউ এসে ঠেলা দিল একটুখানি। বৈঠা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে চলার বেগ তুলতে লাগল বড়ো ভাই। রাত পোয়াল যখন, তখন সে অকূল দরিয়ায়।

জানত, মাঝ-সাগরে ছোটো ছোটো দ্বীপ আছে অগুনতি, লোকে বলাবলি করে ও সব হল ড্রাগনরাজা রিন-জিনের রাজ্যপাট। হোক তাই। তবু চেনাজানা নাগালের বাইরে ওরই কোনো-একটায় দিব্বি রাজার মতন থাকতে শুরু করবে সে নতুন করে। সাতমহল পুরী— দাসদাসী গমগম— সাত-সাতটা দুধধবল ঘোড়া—

লোক পাঠাবে নিরা রাজার কাছে— ক্ষতি কী?— ভেট পাঠিয়ে দেবে বাক্‌শোভর্তি হীরেজহর— নিশ্চয় টনক নড়বে ড্রাগনরাজার— হয়তো তাকে নিতেই পাঠিয়ে দেবেন চতুর্দোলা— নিজেই হয়তো এসে পড়বেন একদিন লোকজন সঙ্গে— উঃ! এই বন্ধুত্ব যদি হয়, তা হলে আর. . .

সাত-পাঁচ রঙিল ভাবনায় বেলা বাড়তে লাগল, সমুদ্রের নিকষ জলে ঝকমক করতে লাগল রোদের আঁচ— উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম কোত্থাও আর দেখা যায় না ভুঁইয়ের আভাসটুকুও। খিদেটাও চাগ দিচ্ছে থেকে থেকে। রোদে আর খিদেয় মিলে তখন ভারি অশান্তি হতে লাগল তার।

দেখেছ আশ্চর্য! আরে যাঁতাটাই তো রয়েছে। খেয়ালই হয় নি। তাই তো! যাঁতায় মোড় দিল বড়ো ভাই। "দাও দিকি নি মেঠাইটেঠাই কিছু। না, ভালো ভালো মেঠাই ছাড়া আজ আর কিচ্ছু না। আশ মিটিয়ে— দাও দিকি আমায় শুধু হরেক মেঠাই পিঠে-পুলি—" হীয়োকো হীয়োকো— আওয়াজ দিয়ে মোড় নিল যাঁতা. . .

ঘুরছে মন্থর— আর চার ধার বেড়ে বের হয়ে আসছে মেঠাই, আরো

মেঠাই— খেয়ে খেয়ে পেট ঢাঁই, কণ্ঠা-অবধি ভরে গেছে— মুখটাও ক্যাটক্যাট করছে মিষ্টিতে— খালি মিষ্টি ভারি মিষ্টি— নাঃ আর পারা যাচ্ছে না, নোনতা একটু মুখে না দিলে উগরে বেরিয়ে আসবে যা খেয়েছে সব, নুন চাই একটু

"শুনেছ? নুন চাই একটু, নুন!"

যাঁতা ঘুরতে লাগল দোশি দোশি দোশি দোশি দোশি— আর চার ধার দিয়ে বের হয়ে আসতে লাগল এবারে নুন— নুনের ওপরে নুন

"আ রে, এত নুন কী হবে? থামো থামো বাপু, ঢের হয়েছে—"

কিন্তু বললে কী হয়! কেউ তো বলে দেয় নি তাকে কিসে থামবে যাঁতা। "থামো, থামো, আর না—"

"থামো—" তার চিৎকার পাক খেতে লাগল অকূল সাগরের জলে. . .

ডাঁই হয়ে উঠল নুনের পাহাড়, তবু ক্ষান্তি নেই। নৌকো চলতে পারছে না আর, ভারবোঝায়। নামছে যেন একটু একটু করে— জলের কানা থেকে একভাঁজ জলের নীচে— নীচে, আরো নীচে— ঝাঁক ঝাঁক মাছ আর কাছিম আর শঙ্খ-ঝিনুক আর সাগরবনের মধ্যে দিয়ে— কে জানে কোথায় গিয়ে ঠেকল শেষ অবধি। কে জানে কতদিনে জলের মধ্যে জল হয়ে গলে গেল নৌকোর কাঠ আর মানুষের শরীর।

গলল না কিন্তু বালখিল্য মুনিদের অক্ষয় পাথুরে সেই যাঁতাজোড়া, পৃথিবীতে যা ছিল একটিই মাত্র— থামল না। কে জানে কী মন্ত্র থামাবার। আজও ঘুরছে— গুরু গুরু গুরু গুরু— এখনও তার চার পাশ থেকে উপচে আসছে নুন. . . এত নুন, সাত-সাতটা সাগরের জল হাকুচ নোনা হয়ে গেল দেখতে দেখতে— এখনও হচ্ছে—